সমাজতন্ত্র যেখানে ব্যর্থ

মুহাম্মদ নূরুল হুদা

সমাজতন্ত্র যেখানে ব্যর্থ

১ম খন্ড

মুহাম্মদ নূরুল হুদা

www.nagorikpathagar.com

মুহাম্মদ শহিদুজ্জামান
পাকুন্দিয়া
কিশোরগঞ্জ

প্রথম প্রকাশঃ
ডিসেম্বর- ১৯৮৯ ঈসায়ী
জমাদিউল আউয়াল- ১৪১০ হিজরী
পৌষ- ১৩৯৬

প্রচ্ছদঃ মোঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্যঃ পনের টাকা মাত্র।

Price TK: Fifteen Only.

কম্পিউটার কম্পোজঃ
কম্পিউটার হোম এন্ড প্রিন্টার্স
৪৪৫/১, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

Shamajtantra Jekhane Bertha by Mohammad Nurul Huda published by Muhammad Shahiduzzaman, Pakundia, Dist. Kishorganj.

www.nagorikpathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা—আম্মাকে

www.nagorikpathagar.com

সূচীপত্র

(ক) **সোভিয়েত ইউনিয়নঃ**

সূচনা

কম্যুনিজমের তত্ত্বকথা

বাস্তব প্রেক্ষাপটেই সমাজতন্ত্রের দৈন্যদশা

(i) অর্থনৈতিক সংকটে সোভিয়েত জনগণ

(ii) সোভিয়েত জনগণ আদৌ কি মুক্তি পাবে?

(খ) **চীনঃ**

বিস্ফোরোন্মুখ কম্যুনিস্ট চীনে সমাজতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা

এক নজরে চীনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অর্থনীতি সমাচার

কৃষি বনাম শ্রমিক কর্মচারী, সংঘাতের কবলে সরকার বনাম শ্রমিক কর্মচারী

সমাজতান্ত্রিক ব্যর্থতার পর বেসরকারী উদ্যোগের এক দশকের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

চীন, ধূমায়িত থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এক বাস্তবতা

ঘনীভূত সংকট কি কাটবে?

দুই বৈরী দেশের সম্পর্ক সমাচার

(গ) **পোল্যান্ডঃ**

পৃথিবীর মানচিত্রে পোল্যান্ড, কিছু-বর্ণনা

পোল্যান্ড যখন পর্যদস্থ হয়

পোল্যান্ডে সমাজতন্ত্র

কম্যুনিস্ট শাসনের অপমৃত্যু ও ডানপন্থীদলের আগমন

কম্যুনিস্টের খতম করেই অকম্যুনিস্ট শাসন শুরু

পোল্যান্ডের মুখ খুলেছে

পোলিশ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী তিক্ততা, কম্যুনিস্ট পার্টির নাম বদল ও ওয়ালেসার বিদায়

এমন যেন না হয় অকম্যুনিস্ট সরকারে

(ঘ) **পূর্ব জার্মানীঃ**

বিসমার্কের জার্মানীতে হিটলার এক কাল অধ্যায়, এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা

আক্রমনকারী হিটলারের যুদ্ধের কিছু সংক্ষিপ্ত কথা

সভ্যতার নির্মম পরিহাস কলঙ্কিত বার্লিন দেয়াল

কম্যুনিস্ট শাসন অবসানে বিক্ষোভ মিছিল ও পূর্ব জার্মান ত্যাগের ব্যাপক হিড়িক

১৯৮৯'র ৯ই নভেম্বরের বার্লিন দেয়াল ভাঙ্গন এক মধুর মিলনের গাঁথা সূত্র

পালা বদলের হাওয়ায় পূর্ব জার্মান ও এরিকহোনেকারের বিদায়

পুরানো বোতলে নতুন মদ, ইগোন ক্রেঞ্জের চিন্তা ধারার প্রতিকৃতি, ক্রেঞ্জের প্রতিজ্ঞা, গির্জার নেতৃবৃন্দের হতাশা

অকম্যুনিস্ট সরকারের ধারাবাহিকতা

হোনেকারের কম্যুনিস্ট দুঃশাসনের তদন্তের কিছু কথা

গণতন্ত্রের দাবী ও জার্মানের পুনরেকত্রীকরণ ও সঙ্কটপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা

জার্মানীর একত্রীকরণ

পূর্ব জার্মানীর অর্থনীতির কিছু প্রেক্ষাপট

www.nagorikpathagar.com

মুখবন্ধ

আপাততঃ লেখক হিসাবে আমার বলার কিছু নেই। খুব প্রস্তুতি নিয়ে এ গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। উপরন্তু প্রথম প্রয়াস। পত্র–পত্রিকার মাধ্যমে লেখা চর্চা এতোদিন বজায় ছিল। আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি আগ্রহ বরাবরই। সে সুবাদেরই পূর্ব ইউরোপসহ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনে সমাজতন্ত্রের ক্রমাগত বিপর্যয় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সচেতন পাঠকের উৎসুক্য নিবারণের জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রথমে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় 'সমাজতন্ত্র যেখানে ব্যর্থ' এ শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে প্রবন্ধ ছাপা হতে থাকে। এ পর্যায়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও অনেকেই তাগিদ দেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশ তো চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে নতুন লেখকের জন্য আরো দুরুহ ব্যাপার। এ ব্যাপারে উদার হৃদয় নিয়ে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক মুহাম্মদ শহিদুজ্জামান। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তৈরীর ব্যাপারে তাগিদ এবং সার্বিক উৎসাহ সহযোগিতা করেছেন কবি সোলায়মান আহসান তাঁর প্রতি, আরেক উৎসাহের স্থল আমার এক বড় আপা পারভীন খালেদার প্রতি ঋণ থেকে গেলো। এ প্রসঙ্গে জনাব আবুল হাশিম ও জনাব নিয়াজ মাখদুমের নাম উল্লেখ্য। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইলো। সচেতন পাঠকের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, গঠনমূলক সমালোচনা জানালে সমাদরে গৃহীত হবে।

মুহাম্মদ নুরুল হুদা
ছারিয়াপুর, টাঙ্গাইল

www.nagorikpathagar.com

মার্কস যদিও কম্যুনিজমে উত্তরণের একটা অর্থনৈতিক তত্ত্ব দাড় করিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণে কম্যুনিস্ট বিপ্লব কোথাও আসেনি। হয়তো তা বাস্তব নয় বলেই। সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের অস্বাভাবিক পথে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তার সহজাত দুর্বলতার বিষয়টা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ দুর্বলতা নিয়ে শুধু শক্তির দাপটে কম্যুনিজম বেশী দিন টিকবেনা– একথা সেদিন অনেকেই বলেছিল। ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর এর প্রথম ইংগিত পাওয়া গেল। আর আজ নতুন ক্রুশ্চেভ গর্বাচেভের আমলে তা হাটে হাঁড়ি ভাঙার মতই প্রকাশ হয়ে পড়ল। চীনেও এ দৃশ্যই আমরা দেখছি। কিন্তু এ দু'দেশের বজ্রমুষ্ঠিতে কিছুটা চিড় ধরলেও তা এখনও অটুট বলেই কম্যুনিস্ট শাসন কাঠামো সেখানে টিকে আছে। পূর্ব ইউরোপের অবস্থাটা ভিন্ন। মস্কোর ভয় ছিল পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিস্ট শাসনের ভিত্তি। গর্বাচভের পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনষ্ট খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিজমকে একটা ঝাকানি দেয়ার সাথে সাথে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট শাসন কাঠামোয় ধ্বংস নামল। মাত্র এক বছরের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের পোলান্ড, হাংগেরী, পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লাভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া থেকে কম্যুনিস্ট শাসন প্রায় বিদায় নিল।

তরুণ লিখিয়ে মুহাম্মদ নূরুল হুদা কম্যুনিস্ট দেশগুলোতে কম্যুনিজমের ব্যার্থতার একটা চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন। বিষয়টা খুব সহজ নয়। আদর্শিক কম্যুনিজমের শেষ দশা আমরা দেখছি বটে, কিন্তু মস্কো ও পিকিং এর সামরিক শক্তির আড়ালে রাজনৈতিক কম্যুনিজম বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। আর রাজনৈতিক কম্যুনিজম বেঁচে থাকলে মার্কসের কম্যুনিজম বিদায় নিলেও গর্বাচভের কম্যুনিজম থাকবে যতদিন না পূর্ব ইউরোপের পুণরাবৃত্তি সেখানে ঘটছে। এসব ভবিষ্যতের কথা বাদ দিলে মার্কসীয় কম্যুনিজমের ব্যার্থতার একটা উপাখ্যান ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। লেখক নূরুল হুদা এ দিকেই তাঁর দৃষ্টি দিয়েছেন। সব সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা এই বইয়ের ছোট্ট কলেবরে আসেনি। আমি আশা করছি, লেখক তার অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করবেন। লৌহ যবনিকার অন্তরালের যে কথাগুলো লেখক এ বইতে দিনের আলোতে নিয়ে এসেছেন, তা পাঠকদের যথেষ্ট উপকৃত করবে বলে আমি মনে করি।

আবুল আসাদ
ঢাকা, ২৪শে ডিসেম্বর'৮৯

www.nagorikpathagar.com

সূচনা

পৃথিবী ব্যাপী মানুষকে ধোঁকায় ফেলার জন্য একটি পোকা বিড় বিড় করছে। পৃথিবীর মানুষগুলো যখন নির্যাতিত নিষ্পেষিত, যেখানে সিংহভাগ জনগোষ্ঠী অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যে মানুষগুলো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জ্ঞানপাপী, যারা মুনাফিক সুবিধাবাদী হিসেবে খ্যাত, তারা সবাই যেন বিড়বিড় করা পোকাটির নিকট জিম্মী। সমাজতন্ত্রবাদ নামক পোকাটির জন্ম ইতিহাস যত পূর্বের হোক না কেন ১৮৩০ সালের দিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। বেশ পূর্বে প্লেটো থেকে র‍্যাঙ্কিন পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিবর্গ যখনই মানুষের মৌলিক (অর্থনৈতিক চাহিদা) বিষয়গুলো উদঘাটন করতে গিয়েছেন, ধরতে গেলে তখন থেকেই সমাজতন্ত্র নামক পোকাটির জন্মান্তর শুরু হয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণ, স্বৈরাচারমূলক ধোঁকাবাজ খৃষ্টীয় যাজকদের কীর্তিকলাপই সমাজতন্ত্রের বীজ বপন করেছে শ্রেণী সংগ্রাম নাম ধারণ করে।

সমাজতন্ত্র এসেছিল কার্লমার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে। শ্রমিকরা সকল উৎপাদন শক্তির অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় সর্বস্তরের জনতাকে শ্রেণী সংগ্রামে বিভাজন করে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছে। অত্যাচারী শ্রেণীর বিলোপ সাধন করে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। আরও দেখা যায় রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের কথা। ধারণা ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুই এর অভ্যন্তরে শুধুমাত্র নিজেকেই রক্ষা করে না বরং বিপরীত সত্তাকে বহন করে। অস্তিত্বের ধারণা নিজের মধ্যেই অস্তিত্বহীনের ধারণা বহন করে। এই পরস্পর বিরোধী শক্তির ক্রিয়া প্রক্রিয়া থেকেই নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেখা দেয়। মার্কস মনে করেন, প্রত্যেক যুগের বাস্তব অবস্থা শ্রেণী–সংঘাত ঘটায়। ঠিক এভাবে মিলানো হয়েছে যেমন, প্রাচীন কালে ছিল স্বাধীন লোকও দাস, মধ্য যুগে সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস, বর্তমানে আছে পুঁজিপতি ও শ্রমিক। যাদের আছে তারা সব সময়ই নিজেদের অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছে, আর যাদের নেই তারা শোষিত। ফলতঃ শোষক শোষিতের বিরোধের শ্রেণী সংগ্রাম হয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রের ধারণায় আরও পাওয়া যায়, উৎপাদন যন্ত্রাদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে না থেকে রাষ্ট্রীয়করণে চলে আসলেই শ্রেণী বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। সমাজতন্ত্র আরও অস্বীকার করেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃহৎ শিল্পায়ন কারখানায়, ব্যাংকিং, বীমা, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ইত্যাদি। পুঁজিবাদের সুদী কারবারকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা হয়েছে। তাই একজন কমরেড বা এ পথের অনুসারীদের পক্ষে একাধারে কম্যুনিষ্ট থাকা ও সুদী লেন–দেন করা আদৌ সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চায় ধন বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা। যেহেতু ব্যক্তি মালিকানা অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে তাকে সম্পূর্ণ রূপে সমাজের একজন কর্মচারী ও দাসে পরিণত করা কেবলমাত্র অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয় বরং অধিকতর ব্যাপকার্থে মানুষের সমগ্র তমদ্দুনিক

www.nagorikpathagar.com

জীবনের জন্য ও ক্ষতিকর সেখানে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিঃসন্দেহে ভালো দিক। আধুনিক ধারণায় জোয়াদের মতে,

(ক) কোন সমাজে সমাজতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে যে সব পদক্ষেপ নিতে হয় সেগুলো হচ্ছেঃ উৎপাদনের উপাদান সমূহের ব্যক্তি মালিকানা রহিত করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। এ সংগে বৃহৎ শিল্প কারখানা ও সার্ভিস সমূহের নিয়ন্ত্রণভার সরকারের হাতে নেয়া;

(খ) শিল্প ও কল কারখানার উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিরূপণ করা যেখানে মুনাফা অর্জনের মানসিকতা থাকবে না;

(গ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদনকে সমাজ সেবামূলক উপাদানে পরিবর্তিত করা। H. D Dickinson বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমের মূল্য এবং শ্রমিককে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। অর্থাৎ একমাত্র হিসাবের উদ্দেশ্য ছাড়া মজুরীর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। বস্তুতঃ জাতীয় আয় প্রয়োজন অনুসারে কিংবা সমতার ভিত্তিতেই বন্টন করা হবে অবশ্য তার এই মন্তব্য অথরিটারিযান সোসালিজম সম্পর্কেই প্রযোজ্য, উদার নৈতিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নয়। সমাজতন্ত্র পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রে মজুরীর পার্থক্যকে শুধুমাত্র হিসাবের জন্যই ব্যবহার করা হয়। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; বরং চাহিদা অনুসারে উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে যাতে বাধ্যবাধকতার আশ্রয় নিতে না হয় সে জন্যও মজুরীর তারতম্যের প্রয়োজন। অস্কার ল্যাঞ্জ মনে করেন যে, প্রকৃত মজুরীর তারতম্য হবে খুবই নগণ্য। কারণ যে সব কাজে মজুরী কম সেখানে বিশ্রাম, নিরাপত্তাও মনোজ্ঞ পরিবেশ মজুরীর পার্থক্যকে পুষিয়ে দেয়। অবশ্য অধিকাংশ সোসালিষ্টের মতে যোগ্যতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মজুরীর পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ যে শ্রমিক অধিক কাজ করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক তার পারিশ্রমিক অধিক হওয়া উচিত। এতে কিছু অসমতা হয়ত হবে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ থেকে আয়ের পথ রুদ্ধ থাকা এবং কেবলমাত্র শ্রমের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আয়ের এটুকু পার্থক্য গ্রহণযোগ্য

কম্যুনিজমের তত্ত্বকথা

Latin শব্দ 'কমিউনিস' থেকে এর উদ্ভাবন ঘটেছে। ১৮৩০-৪০'র দিকে শব্দটির প্রচলন না ঘটলেও ১৯৩৫-৩৯ সালের দিকে প্যারিসে গোপন বিপ্লবী সংস্থা কর্তৃক শব্দটি গৃহীত হয়। মার্ক্সীয় দর্শনে দেখা যায়, আর্থসামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সক্রিয় সংগ্রামকেই কম্যুনিজম বুঝানো হয়। আন্তর্জাতিক সোসালিষ্ট দল দাবী করছে যে, সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে কম্যুনিজম হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পরবর্তী ধাপ। মার্ক্স মনে করেন অর্থনীতিকে সমাজের ভিত্তি এবং ধর্ম, আইন প্রভৃতিকে তার গাঁথুনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধর্ম ও নৈতিকতা সমাজের বিত্তশালী লোকজন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, ফলে সত্যিকারের ন্যায় বিচার সমাজের কোথাও

www.nagorikpathagar.com

পাওয়া যাবে না; অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারীগণ আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কমিউনিজম দর্শনে মার্ক্সের ৫টি শিরোনামে বিশ্লেষিত হয়েছে।

(ক) কেন্দ্রীভূতকরণ বিধি;

(খ) উদ্বৃত্ত মূল্য;

(গ) শ্রেণী সংগ্রাম;

(ঘ) মন্দার অতি উৎপাদন তত্ত্ব এবং

(ঙ) সামাজিক বিপ্লব। মার্ক্সের Suvplus Valuc তে দেখা যায় উৎপাদনের একমাত্র উপাদান হচ্ছে শ্রম, অথচ শ্রমিক কেবলমাত্র খেয়ে পরে বাঁচার মত পয়সা কড়ি পায়। পাশাপাশি পুঁজিবাদীদের পুঁজি স্ফীতকরণ হয়। মার্ক্স কম্যুনিজমের দর্শনকে Strongly স্থাপিত করার প্রয়াস পান। এভাবে সর্বহারা জনগণ বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতিদেরকে সম্পদের মালিকানা থেকে হটিয়ে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করবে। এ পর্যায়ে সর্বহারার ডিক্টেটরশীপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে কোন মূল্যে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ক্ষমতা দখল করে কঠিন হস্তে দেশ শাসন করতে হবে এবং জনগণ সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ডিক্টেটরশীপ চালাতে হবে। অর্থাৎ জোরপূর্বক কম্যুনিজমের আদর্শ কায়েম করতে হবে। যেটাকে বলে দ্বিতীয় ধাপ। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য Brain wash করে হলেও একটি বুদ্ধিজীবী কর্মী বাহিনী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। খোদ রাশিয়াতে সার্বজনীন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কম্যুনিজমের আদর্শ ও নিয়মকানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালান হয়। আর্ট, নাচ, গান ও নাটক প্রভৃতির মাধ্যমেও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ধর্মীয় পদ্ধতিতে বিয়ে নিষিদ্ধ তাই কোর্ট ম্যারেজ করা চলে। ধর্মীয় প্রোগ্রাম নিষিদ্ধ হলেও কমিউনিজমকে ধর্মের সমান মূল্য দেয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক চীন বিষয়ক কতিপয় ধারা

চীনে সরকারী শিল্প ও কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যে সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি হলো 'শ্রমিকগণের সামষ্টিক দর কষাকষি কিংবা সংগঠন করার আজাদী ভোগের কোন অধিকার নেই। নিয়ম ও শৃংখলা মেনে শ্রম করে যাওয়াই তাদের একমাত্র কর্তব্য।'

সর্বমোট ২৪টি ধারার মধ্যে দেখা যায় (ক) যেসব শ্রমিকদের নিকট সরকারী রিপোর্ট নেই তাদেরকে কাজে নিয়োগ করা বেআইনী। (খ) উক্ত বিধানের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে "মজুরীর জন্য দর কষাকষি করা চলবে না। বরং প্রত্যেকটি কাজেরই মজুরী নির্ধারিত মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। (গ) ৪র্থ ধারায় দেখা যায়, কোন শ্রমিক বা আমলার কর্মচারী, ম্যানেজার অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার মজুরী ব্যতীত কাজ ত্যাগ করতে

www.nagorikpathagar.com

পারে না। তাকে স্থানান্তরে বদলীও করা যেতে পারে না। এটা মেনে কাজ করা না হলে সংগঠন ও বিধান রীতির বিরুদ্ধতা করা হবে। (ঘ) ৫ম ধারার আইন বাধ্যতামূলক করা হয়। কোন শ্রমিককে তার মর্জি না নিয়ে স্থানান্তরে পাঠান যেতে পারে না। কিন্তু বিধানের বিরুদ্ধতা করা হলে শ্রমিক শুধু ট্রেড ইউনিয়নের নিকট অভিযোগ করতে পারবে তার অধিক কিছু করার অধিকার তার নেই। (ঙ) আর ৮ম ধারায় শ্রমিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে শ্রমিকরা কারখানার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব গোপন তথ্য সংরক্ষিত করবে, সরকারী মালের হেফাজত করবে ও প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময় নিজ নিজ কাজ সম্পূর্ণ করে নিবে। কাজের সময় সম্পর্কে কয়েকটি ধারা সংযোজিত হয়েছে। যেমন কাজের সময় নির্ধারণের পূর্ণ ইখতিয়ার কেবল কারখানার ব্যবস্থাপকদেরই থাকবে। কারখানায় প্রবেশকালে ও নির্গমনের সময় প্রত্যেক শ্রমিকের তল্লাসী নেয়া হবে। সমাজতান্ত্রিক চীনের গোড়ার দিককার শ্রমিক রাজত্বের মিষ্টি কথার এসব আইন ও বিধান সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় সেখানে মানবিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। শ্রমিকদেরকে ন্যুজ করে দেয়া হয়েছে। বাক স্বাধীনতা হরণসহ প্রচন্ডভাবে যুলুম করা চীনা একনায়কতন্ত্রী সরকার বেশ সফলভাবেই করেছে।

বাস্তব প্রেক্ষাপটেই সমাজতন্ত্রের দৈন্যদশা

একনায়কতন্ত্রী ডিক্টেটরশীপের সমাজতন্ত্র সত্যিকারার্থেই মানুষের আরাম-আয়েশ কেড়ে নিয়েছে। বিগত শিল্প বিপ্লবের ঘটনা প্রবাহ যে হারে ঘটে চলেছিল তাদেরকে তথাকথিত মানব বিধ্বংসী স্বল্প সময়ের সমাজতন্ত্রবাদী গণতন্ত্রকে হরণ করে নিয়েছে- নিয়েছে মানুষের মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহ। যে দরদ গরীবের জন্য দুধের নহর বইয়ে দেবার কথা ছিল তা সমাজ দেশ তথা বিশ্বব্যাপী বিষতুল্য প্রমাণিত হয়েছে। তাইতো সমাজতন্ত্রের মৃত্যু ডঙ্কা বেজে উঠেছে। রোজ রোজই পত্রিকার পাতায় বেরুচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাস্তব চিত্র। নিম্নের আলোচনায় তার পরিস্ফুটন ঘটবে।

অর্থনৈতিক সংকটে সোভিয়েত জনগণ পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ট

বিতর্কিত গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা কর্মসূচীসহ নানাবিদ পদক্ষেপ আলোচনা সমালোচনা উভয়েরই ঝড় তুলেছে। একে কেন্দ্র করে সোভিয়েত পলিটব্যুরোতে ভাঙ্গনের অশনি সংকেত শোনা যায়। ১৯৮৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন প্রধান নেতাকে পার্টি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। একাধিক নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতা বিরোধী নেতাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতিগত দাঙ্গা চরমে

www.nagorikpathagar.com

পৌঁছে। সোভিয়েত জনগণের বিবিধ ও অর্থনৈতিক সংকটের কথা আর কষ্ট করে জানতে হয় নি। কারণ লেনিন, স্টালিন ও ব্রেজনেভের মত লম্পট, বর্বর ও দুর্নীতিবাজ শাসকরা ক্ষমতার মসনদে নেই। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ সমাজতন্ত্রবাদ নামক মদের বোতল নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করতে রাজী নন। তাইতো বৃটেন সফরকালে তিনি লন্ডনের ঐতিহাসিক গিল্ড হলে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন তাতে করে প্রমাণিত হয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ কোন হাল হকিকতে আছে। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ ভাষণের উদ্ধৃতি পেশ করা হলোঃ যখন আমার দেশ ভূমিকম্প নামক প্রকৃতির হিংস্র থাবায় লন্ডভন্ড হয়েছিল, আর্মেনিয়ায় নিমিষের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবনের দীপশিখা নিভে গিয়েছিল, সে মুহূর্তে আমার এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আমি আমার সফর পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ আমি আমার সফর কর্মসূচী সফল করতে পেরে গর্ববোধ করছি। আমি সোভিয়েত ইতিহাসে প্রথমবারের মত বিরোধী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছি।

এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ে ১৯৬৮ সালের কথা। আমার সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত ভোটদাতা হিসেবে তখন আমি ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য আমি দেখতে পেলাম তা মনে করলে ঘৃণায় এখনও আমার মন সংকুচিত হয়। আমি সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত হবার পূর্ব থেকেই এ কুটজাল ও প্রতারনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা শুরু করেছিলাম। ১৯৬৮ সালের চেকোশ্লোভাকিয়ায় এক শুভ বসন্তে অভাবনীয়ভাবে কম্যুনিষ্ট নেতারা মতবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে দূরে সরে যেতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার পূর্বসূরী লিওনিদ ব্রেজনেভের আদেশ অমান্য করতে শুরু করে। বলতে দ্বিধা নেই ব্রেজনেভ ছিলেন একজন লম্পট, বর্বর ও দুর্নীতিবাজ লোক। কেন এখনও রুশ বিপ্লবের অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হবার পর আমাদের অবস্থা পশ্চাদপদই রয়ে গেছে? অথচ আমাদের তো উদ্দেশ্য ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বিশ্ব গড়ে তোলা। কিন্তু এর পরিবর্তে এখনও অগণিত মানুষ আটক রয়েছে কারাগারে। মূলত সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা চলে একটি স্বৈরতন্ত্রের আওতায়। সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, সংবাদপত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলো যে সংবাদ পরিবেশন করে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। আমার এ কথাগুলো আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। সর্বোপরি তৃতীয় বিশ্বের চরম দারিদ্র পীড়িত জনগণের মত লক্ষ লক্ষ জনগণ সেখানে ক্ষুধার্ত। হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত, সোভিয়েত জনগণ ক্ষুধার্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উর্বর শক্তিসম্পন্ন ভূখন্ডে বসবাস করেও আমাদের জনগণ ক্ষুধার্ত। বিশ্বের একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়েও আমরা আমাদের জনগণকে খেতে দিতে পারি না। এমনকি প্রচন্ড শীতে আমরা যোগান দিতে পারি না সৈন্যদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জুতা ও মোজা। এখনও আমাদের দেশের হাসপাতালসমূহের এক তৃতীয়াংশেও গরম পানির ব্যবস্থা নেই। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শোষণ পীড়িত জাতি হয়েও দঃ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের গাড়ীর পরিমাণ

www.nagorikpathagar.com

আমাদের জনগণ অপেক্ষা আট গুণেরও বেশী। ৭ কোটি মানুষের এখনও মাথা গোঁজার মত চিলেকোঠা পর্যন্ত নেই। আমাদের পশ্চাদপদতার জন্য কেবল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা রয়েছে শুধু তাই নয়। সেখানে চলে ত্রাসের শাসন। প্রতিটি মানুষকে প্রহর গুণতে হয় অদৃশ্য শক্তির হাতের ইশারার ভয়ে। সে শক্তিটি হচ্ছে কেজিবি।

বোধ করি, কোন মানুষই জানতে পারবে না কোন দিন স্টালিনের বদ্ধভূমি আর কারাগারের রুদ্ধ প্রাচীরে কত মানুষ হয়েছিল হত্যাযজ্ঞের শিকার। হয়তোবা এর পরিমাণ দেড় কোটি অপেক্ষা কম হবে না। হিটলারের হত্যাযজ্ঞেও ঘাতকদের সাথে আমাদের দেশের হাজার প্রতি একশত মানুষ জড়িত ছিল। জার্মানীকে আমরা তৃতীয় ক্রিমিন্যাল রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করি। কিন্তু বলুন, আমাদের নিজেদের কি বলে সম্বোধন করা উচিত?

আজ সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে, সেখানে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না অফিসিয়ালী যদি কোন তথ্য আমার কাছে না পৌঁছে, তবে আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। অসত্যের কাঁটাতারের বেষ্টনীর পশ্চাতে আমি অবস্থান করছি। এ জন্য আমি দু'টি নীতিমালা গ্রহণ করেছি। একটি হচ্ছেঃ সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি হিংস্র জাতি অপেক্ষা বিশ্বের দরবারে সম্পদশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এ জন্য অনেক অসুবিধার মোকাবিলা করতে হবে। অন্যটি হচ্ছে, প্রশাসনিক বিন্যাস সাধন করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমি চরম পরীক্ষার সম্মুখীন। যদি আমার গৃহীত কর্মসূচী সফল না হয় তবে এর জন্য ৭০ বছর আগে অর্জিত সমাজতন্ত্রই দায়ী। কারণ এ মতবাদ স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে জনগণের মধ্যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উপকরণগুলোসরবরাহেব্যর্থহয়েছে।

এবারে আমি নির্বাচন প্রসঙ্গে যাবো। আমার প্রতিপক্ষ দেশগুলো সমালোচনা করেন যে, আমি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছি। কিন্তু তারাও বিগত নির্বাচনের পর এখন বুঝতে বাধ্য হচ্ছেন যে, সোভিয়েত জনগণ গণতন্ত্র চায় এবং আমি তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার মত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পেরিছি। সত্যি সত্যিই আমি সোভিয়েত জনগণকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সদ্য স্বাক্ষরিত চুক্তির দলিল যা এখনও আমার টেবিলের উপর রয়েছে। আমি চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, পূর্বজার্মানী থেকে সমস্ত সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছি। প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন আমি আমার সত্যভাষণ এখানে উপস্থাপন করলাম। কারণ আমার নিজের দেশের থেকে শত সহস্রগুণ গণতন্ত্র বৃটেনে বিদ্যমান রয়েছে, বিধায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিশ্ব মানবের হারানো অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন আমরা দেখতে চাই, তবে গণতন্ত্র ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আমি আজ নিঃশংক চিত্তে ঘোষণা দিচ্ছি, বিশ্ব থেকে জনগণের সরকার জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার, এ প্রথার কোন অবলুপ্তি হবে না।

www.nagorikpathagar.com

পেরেস্ত্রয়কা ও সোভিয়েত নির্বাচন নতুন আলোকে রাশিয়াতে পেরেস্ত্রয়কা ও ১৯৮৯'র সোভিয়েত নির্বাচন আলোচনার দাবী রাখে। সোভিয়েত জাতিকে প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ নতুন ধ্যান-ধারণায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। মিখাইল গরবাচেভ অর্থনীতি ও রাজনীতির সংস্কার স্বরূপ পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্তের প্রণেতা। তবে পেরেস্ত্রয়কা কর্মসূচী ধীরে ধীরে দুরবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গরবাচেভের স্বীয় প্রচেষ্টায় পেরেস্ত্রয়কার মডেলের আলোকে নিজস্ব বিনিয়োগের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম শিল্প ইউনিট মস্কোর কাছে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বুটোভা প্রকল্পে দালানের সাজসরঞ্জাম তৈরী করা হয়। ১৯৮৮'র প্রথম দিকে মিখাইল বোচারভ বুটোভা কোম্পানীর সাড়ে চারশ' শ্রমিকের মধ্যে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দেন। এছাড়া এসব কর্মচারীকে তাদের বিনিয়োগের জন্য শতকরা ৬ ভাগ সুদ দেয়ার অঙ্গীকার করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব থেকে আমানতকারীরা যে হারে সুদ পায়, এখানে তাদেরকেও দ্বিগুণ সুদের আশ্বাস দেয়া হয়। বুটোভা কোম্পানীর উৎপাদন প্রক্রিয়াও সেকেলে ধরনের প্লান্টে আধুনিকায়ন করা হয় তবে তা পশ্চিমা দেশগুলোর ১৯২০ সালের দিকের প্রযুক্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সোভিয়েত বাজার দর

	দ্রব্যের নাম	সরকারী দর	ফ্রি—মার্কেট দর
১।	টমাটো (১ কিলো)	৩রুবল	১৫-২০রুবল
২।	রুটি	২৫ কোপেক	৭০ কোপেক
৩।	গোশত (১ কিলো)	১,৯০ রুবল	৮,১০ রুবল
৪।	রেফ্রিজারেটর	৩৬০রুবল	২ হাজার রুবল
৫।	ভগলা গাড়ী	১৭ হাজার রুবল	আমদানীর জন্য ২ হাজার রুবল

এখনও সোভিয়েত দেশের পরিকল্পনা কম্যুনিষ্টদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় থাকায় বুটোভা কোম্পানীর পরিচালক মিখাইল বোচারভ তার চিন্তা-চেতনা কাজে লাগাতে পারেননি। তিনি প্রকল্প চালানোর জন্য আরও স্বাধীনতা চান। পেরেস্ত্রয়কার সূচনায় স্বল্প স্থায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর সবারই জানা। জীবনযাত্রার মান নীচে নেমে আসে। মুদ্রাস্ফীতি ও বাজেট ঘাটতি একটা সমস্যার অবতারণা করে। গরবাচেভের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আবেল আগনেবেগিয়ান মন্তব্য করেন যে, গোশত, দুগ্ধজাত জিনিসপত্র এবং রুটির মূল্য আগামীতে দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। গরবাচেভ স্টালিনের সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেন এবং কৃষিতে আরো বেসরকারী খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১ হাজার কোটি ডলারের ঘাটতি বাজেটের কথা অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেন। কর্তৃপক্ষ ঘাটতির পরিমাণ তিনগুণ বলে স্বীকার করেন। কয়েক বছর ধরেই তেলের

www.nagorikpathagar.com

রফতানি মূল্য কমে যাওয়ার দরুন বাজেটে ঘাটতি বেড়ে যায়। এ ছাড়া চেরনোবিলের পরামাণু দুর্ঘটনা ও আর্মেনিয়ার ভূমিকম্প বাজেট ঘাটতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

গরবাচেভের পেরেস্ত্রয়কাকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন অভিমত ও সুপারিশ করেন, সেগুলো হল যেমন সামরিক খাত থেকে অর্থনেতিক সম্পদ আরো বেশী হারে বেসামরিক এবং জনগণের উৎপাদন খাতে বাড়াতে হবে। গরবাচেভও সামরিক বাজেটে ১৪·০২ ভাগ বরাদ্দ হ্রাসের কথা বলেন কিন্তু তাতেও অর্থনীতির বারোটা বাজা বন্ধ করা যাবে না। বেশী হারে বিদেশী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানির মাধ্যমে রুশ দোকানের লাইন কমানো দরকার। প্রতি বছর মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ৫ থেকে ৭ ভাগ বাড়ার কথা বললেও পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের মতে তা ১০'র কাছাকাছি। সোভিয়েত মানুষের হাতে অর্থ আছে, কিন্তু ক্রয় করার জিনিস নেই অর্থাৎ পেরেস্ত্রয়কা অভিযান শুরুর পর বাজার থেকে জিনিসপত্র হাওয়া হয়েযায়।

তবে গর্বাচেভের পেরেস্ত্রয়কা কৃষির উপর সামান্য প্রভাব ফেলে। এদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী আলু উৎপাদিত হয়। সোভিয়েত সরকারী ও সমবায়ী খামারে যে আলু উৎপাদন হয় তার মাত্র ২৫ ভাগ সোভিয়েত নাগরিকরা খেতে পারে। বাকি আলু পচে যায়। তাই গর্বাচেভ কৃষকদেরকে সরকারের জমি লীজ দেয়ার কথা বলেন।

এদিকে গ্লাসনস্ত কর্মসূচীতে গেলো মার্চে (১৯৮৯) নতুন গণতান্ত্রিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন হয়ে গেল। এ নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তা কয়েকটি বড় বড় শহরে নির্বাচনে জয়লাভে ব্যর্থ হন। নির্বাচনে আঞ্চলিক পার্টি প্রধান ও ক্ষমতাসীন পলিটব্যুরোর ভোটাধিকার বিহীন সদস্য ইউরী সলবিস্তক পরাজিত হন। লেনিন গ্রাদ থেকে পরাজিত ৩ জন প্রার্থীই কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্ধারনী কমিটির সদস্য। সোভিয়েত রাজধানীর পার্টি কমিটির প্রথম সেক্রেটারীও নির্বাচনে জয়লাভে ব্যর্থ হন। কম্যুনিষ্ট পার্টির মত বিরোধী বরিস ইয়েলেৎসিন শহর ব্যাপী নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হন।

৭০ বছরে এই প্রথম সোভিয়েত জনগণকে তাদের পছন্দমত প্রার্থী বাছাই করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমানবিক দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা বিশেষ করে বেলো রাশিয়ার গোমেল মোগিলেভ'র কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতাদের জনগণ চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ইয়েলেৎসিন কম্যুনিষ্ট পার্টি সমর্থিত প্রার্থীকে পরাজিত করেন ৯–১ ভোটের ব্যবধানে। রেডিও টিভিতে নির্বাচনী প্রচার যথারীতি করলেও ইয়েলেৎসিনের বেলায় তা চেপে যান, গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের বিজয়ী নামগুলো জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গেনাডী গ্রাসিমভ বলেন, এই নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হলো যে, শুধুমাত্র নেতৃবৃন্দের উপর আস্থা রাখলেই চলবে না। পার্টিকে মূলতঃ

www.nagorikpathagar.com

জনগণের উপর আস্থাশীল হতে হবে। গর্বাচেভের মন্তব্য, তারাই হেরে গেছেন যারা পার্টির নয়া গণতান্ত্রিক নীতি বুঝতে পারেননি কিংবা এই নীতির সাথে তারা তাল মিলাতে পারেননি।

সোভিয়েত জনগণ আদৌ কি মুক্তি পাবে?

ইদানীং বিশ্বব্যাপী স্বাধিকারের দাবী বেশ প্রবলভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়াতে জনগণ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই বিক্ষোভ ও মিছিলের মহড়া চালায়। কম্যুনিষ্ট শাসিত সোভিয়েত রাশিয়াতে জনগণ অত্যাচারিত হয় বেশ পূর্ব থেকেই। শুধু তাই নয়, তারা তাদের অর্থনীতিতে ধস নামাতে আস্থা রাখতে পারেনি। রাশিয়ায় ১৯৮৯ সালে বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪০১০ কোটি ডলার। খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে রাশিয়ার কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রায় বছরই উর্ধতন মহলে বেশ রদবদল করতে হয়। ১৯৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট গরবাচেভকে এ ব্যাপারে কড়া হুঁশিয়ারী দিতে দেখা যায়। তিনি এক পর্যায়ে বলেন যে, অবিলম্বে খাদ্য সমস্যার সমাধান না হলে সোভিয়েত সমাজের স্থিতিশীলতা গুরুতরভাবে বিপন্ন হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, খাদ্য ঘাটতি সমস্যার সমাধান করতে না পারলে গোটা সংস্কার কর্মসূচীই পন্ড হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই রুবলকে ডলারে রূপান্তর করার সর্বোত্তম পদ্ধতি যিনি উদ্ভাবন করতে পারবেন তার জন্য ২৫ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। রূপান্তরটি হবে এমন, যেমন সোনা ও রফতানি পণ্য গচ্ছিত রেখে ভাঙ্গানো সম্ভব হয়। মূল কথা ডলারই রুবলের প্রধান বিনিময় মূল্য হিসেবে ধরা হবে। সত্যিকারার্থে মার্ক্সবাদের আওতাধীন সরকারে অর্থনীতি সফলতা লাভ করতে পারেনি। তাইতো মুদ্রামান (রুবলের) বিশ্ববাজারে কমে গিয়ে (১৯৮৯) ডলারের সাথে ১ঃ১' ৬০তে দাঁড়ায়। বিদেশ নীতির এক পর্যায়ে মুরুব্বী দেশ হিসেবে রাশিয়া অবশেষে ৯ বছর ব্যাপী আফগানিস্তানে সামরিক উপস্থিতিকে পাপ বলে স্বীকার করে নেয়। তিনি এও স্বীকার করেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাশিয়াকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সমস্যা স্বরূপ চরম মূল্য দিতে হয়। (১৯৮৮–৮৯)

জাতিগত দাঙ্গার ফলে গত আগষ্ট পর্যন্ত ১৮ মাসে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানে অন্ততঃ ২০০ জন নিহত ও আহত হয় কম করে হলেও ২০০০ জন। শত শত বাড়ীঘর ধ্বংসলীলায় পরিণত এবং আড়াই লাখ মানুষ বাড়ী–ঘর ছাড়া হয়। এ এক নতুন আলামত। কম্যুনিষ্ট শাসিত রাশিয়াতে নির্যাতিত নিপীড়িত ৪ কোটি মুসলমান মার্ক্স– লেনিনের কম্যুনিজম থেকে মুক্তি ও স্বাধীকার চায়। এমনতর বহু সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে রাশিয়াতে। গরবাচেভ শাসনামলে সংস্কারমূলক যা কিছুই প্রণয়ন ও বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র কমিউনিজম ব্যর্থতার কারণে। জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ সমাবেশ যে হারে পরিলক্ষিত হয় তা তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়। তবে একটা ব্যাপার পরিস্কার যে নির্বাচন সমূহে তারা প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তার পরও কি তারা তাদের

www.nagorikpathagar.com

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে, ইয়েলৎসিন কি ক্রেমলিনের অনুমোদন পাবে? গরবাচেভ কি বিজয়ী নেতাকে পুরোপুরি মেনে নেবেন? অথচ বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, ইয়েলেৎসিন হলেন গরবাচেভ পরবর্তী নেতা। যিনি ভবিষ্যৎ রাশিয়ার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছেন। গরবাচেভ সংস্কার কমসূচীতে ইয়েলেৎসিন সন্তুষ্ট না থাকায় প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ তাকে অপসারণ করেন। অথচ তিনি গরবাচেভের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তার অপরাধ ছিল গরবাচেভ সংস্কার কর্মসূচী শ্লথগতিতে চলছে। চীনের ঘটনায় আশংকা করা হয় যে, জনগণ সেখানে প্রচন্ডভাবে ফেটে পড়তে পারবে কিনা। আরো অধিকতর স্বাধীনতার সপক্ষে সোচ্চার হলে তখন গর্বাচেভের কঠিন পরীক্ষা চলবে। সে পরীক্ষায় তার আসল চেহারা চরিত্র ফুটে উঠবে।। নতুবা জনগণের রুদ্র রোষকে যদি তিনি সম্মানের দৃষ্টিতে সমাধান করতে পারেন তবে ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান নিয়েই বিদায় নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে জনগণ কতটুকু আন্দোলনী ভূমিকায় এগিয়ে আসবে তাও দেখার বিষয়। তবে সামান্যতম যে স্বাদ বা বাইরের আলো হাওয়া তারা দেখতে পেয়েছেন বা পাচ্ছেন তাতে করে আর বোধ হয় বসে থাকার সময় নেই। তার প্রমাণ ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে।

বিক্ষোরোন্মুখ কম্যুনিস্ট চীনে সমাজতন্ত্রের মৃত্যু ঘন্টা

চীনের নেতা মাওসেতুং কার্লমার্ক্সকে তেমন গুরুত্ব দেননি। মার্ক্সের তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কৃষকদের নিয়ে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। মাওসেতুং-এর মতে একটা পিছিয়ে পড়া উপনিবেশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশেও বিপ্লবের পরেও একটা বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণীর উত্থান হতে পারে। তার মতে বিপ্লব একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মাত্র। আর কম্যুনিস্ট পার্টি যাতে আরো কঠোর হতে না পারে সেজন্য দলের দফতরে চড়াও হওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন কিছু কথাবার্তা মাও সেতুংয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

মাও সেতুংয়ের দেশ চীনে সমাজতন্ত্রের পাকাপোক্ততা তেমনটি আসতে পারেনি। খুব বেশী দিন নয় যে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসল কথা হলো সমাজতন্ত্র নামক পঁচা আপেলটির পিছনে চীনা নেতৃবৃন্দ ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত মিছেমিছি তিন তিনটিরও বেশী যুগ অতিক্রান্ত করলেন। এমন কি ছিল সমাজতন্ত্রে যে, তাতে করে অনেকেই নির্যাতিত, নিগৃহীত হলেন, অনেকেই অধিকার হারালেন, মুসলমান হারালো তার ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো মসজিদ মাদ্রাসাসমূহ। অনেক জনতাকেই ইহলোক ত্যাগ করতে হলো। সমাজতন্ত্র দিয়ে মানুষকে পশুত্বের কাতারে নিয়ে যাওয়া হলো, দেখা গেলো সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনের নেতা মাও সেতুং ছাড়াও সমাজতন্ত্রের জনক কার্লমার্ক্স ও লেনিনের ব্যক্তিচরিত্রে বিরাট গলদ রয়েছে। কার্লমার্ক্স তো দিবারাত্র পশ্চিম জার্মানীর শহর বনে মদ্যপান করে দাঙ্গাবাজ করে বেড়াতো।

www.nagorikpathagar.com

সমাজতন্ত্রীদের মহান নেতার ছয় সন্তানের কেউ করেছে আত্মহত্যা, কেউ বা অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। তার বেশ ক'জন উপপত্নী ছিলো। চরিত্রের এমনতর পর্যায়ে তাকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা লেনিনের চরিত্রে তেমনি গলদ ছিলো। চীনের লাল বিপ্লবের জনক চীনের বিপ্লবোত্তর কালের সকল কর্মকান্ডের মহানায়ক মাও সেতুং–এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। ১৯৫৪ সালে বিপ্লবের পর পরিণত বয়সে তিনি নিজের স্ত্রীকে রেখে চিত্র জগতের এক পরমা সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত ঐ সুন্দরীকে তিনি বিয়ে করেন যা ছিল তার অন্তত পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ। সমাজতান্ত্রিক চীনে আজ এ কথা প্রমাণিতঃ সত্য যে, চীনের বিতর্কিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে মাও'র যতখানি রাজনৈতিক আদর্শ কাজ করেছে তার চেয়েও অনেক বেশী কাজ করেছে এই চিত্রাভিনেত্রী।

উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনার নমুনা সমাজতন্ত্রের দিশারীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে কি করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সভ্যতা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বজায় থাকে। সমাজতান্ত্রিকরা মানুষকে পশুর বিকশিত স্তর বলে মনে করে। পশুর অস্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের Administration কে তুলনা করলে ভুল হবে না।

এক নজরে চীনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মূলতঃ চীন ছিলা রাজতন্ত্রের শাসনাধীনে। চীনের জনগণ ৪ হাজারেরও অধিককাল এ শাসন অতিক্রম করেছে। শেষাবধি ১৯১১ সালের পর ডঃ সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে 'উচাং" অভ্যুত্থানের ফলে চীনের জনগণ ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী মুক্তি পায়। জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জাপানের রোষানলে পড়ে। জাপান বৃহত্তম চীনকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি। ফলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বড় ধরনের পরাজয়ই–এর কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। ডঃ সান ইয়াত সেনের কমিন টাং দল ও অন্যান্য উপদলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং ১৯৪৮ সালে কমিন টাং শাসক গোষ্ঠীর হাতে মাঞ্চুরিয়ার পতন ঘটে। কম্যুনিষ্ট পার্টির বিস্তার কালে কমিন টাং শাসক ১৯৪৯ সালে বিতাড়িত হওয়ার পর চীনের সর্বজন বিদিত মহান নেতা মাওসেতুং–এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ঘোষিত হয়।

মাওসেতুং ও চৌ এন লাই'র দেশ চীন কার্যত বিশ্ব থেকে ছিটকে পড়ে। এটা তাদের স্বইচ্ছারই প্রতিফলন। চীনা জনগণ মোট কথায় অনেক দিনই বন্দী জীবন–যাপন করে, তারা শোষিত হয় কম্যুনিষ্ট শাসনে। এই রোষানলের আবর্তে চীনা জনগণ থাকতে চাননি, কিন্তু তেমন বিপ্লবী ভূমিকাও ষাটের দশকে দেখা যায় না। তবে ১৯৬৬ সালের দিকে দেখা যায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সেনাবাহিনী প্রধান, সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী পার্টির প্রচার সম্পাদক,

www.nagorikpathagar.com

তিনজন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি (উপাচার্য) পত্রিকা সম্পাদক, পিকিং-এর মেয়রসহ অনেক লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক ও সরকারী কর্মকর্তা মোট কথায় সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের বহিষ্কার করা হয়। এ সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির ভলান্টিয়ারদের হাতে অনেকেরই প্রাণাপাত হয়। শুধু তাই নয় চীন দেশের শক্তিশালী তাইস প্রেসিডেন্ট লী মাও চী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। বিশ্ববাসীর অজান্তেই এমনি অনেক ঘটনায়ই ঘটে গিয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৯ সালে চীনের শীর্ষ স্থানীয় নেতা দেং কে "পুঁজিবাদের দোসর" হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে ঝেটিয়ে বিদায় করেছে। ইতিপূর্বে ১৯৭৬ সালে মাওসেতুং ও চৌ এন লাইর মৃত্যু ঘটলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক পর্যায়ে মাও পত্নীসহ চার কুচক্রীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত করে সাজা দেয়া হয়। ঠিক তখন থেকেই চীনের নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। চীনা জনগণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ দ্রুত গণতন্ত্রায়নের পথে আন্দোলনের জন্য এগিয়ে আসে।

অর্থনীতি সমাচার

বেশ পূর্ব থেকেই চীনের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা চলছিল। তাই ১৯৮২ সালে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, জ্বালানি সংকট, পরিবহণে সংকট, তথা জনগণের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নপর্যায়ে অবস্থান করে। ১৯৮৭ সালে গ্রামাঞ্চলে কমিউন প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। দেং প্রবর্তিত পদক্ষেপের মধ্যে বেসরকারী করণের পদক্ষেপও ছিল। কিন্তু চীনের সাম্প্রতিক যে হাল তাতে করে এটা নিশ্চিত বলা যায় যে, চীনের অর্থনীতি মজবুত স্থানে নেই। চীন নেতৃবৃন্দকে সামগ্রিক পরিস্থিতিই সামলাতে হচ্ছে। গেলো রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর জুলাইতে (১৯৮৯) গৃহবধূরা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাজারের বাইরে ফুটপাতে তাজা শাক-সব্জীর পসরা সাজাতে বসে। ইতিমধ্যেই তিয়েন আনমেন চত্বর দেশী-বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়াহয়।

১৯৮৯'র এপ্রিলের মাঝামাঝিতে ছাত্র অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের অর্থনীতি যেমন ছিল চলতি অবস্থায় খারাপ বৈ ভালো নয়। ১৯৮৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার শতকরা ২৫ ভাগ ছাড়িয়ে যায়। চাষীদের ফসলের মূল্য পরিশোধের নিমিত্তেই হয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে হবে নতুবা ভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। ১৯৮৯'র গণহত্যা ও অন্যান্য প্রেক্ষাপটেই বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকাসহ কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ চীনকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান আপাততঃ স্থগিত ঘোষণা করে। ১৯৮৯'র ২৭শে জুন জাতীয় টেলিভিশনে দেং তার ঐতিহাসিক ভাষণে উল্লেখ করেন, সুসমন্বিত পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও আরো একটু বাজার নিয়ন্ত্রণ এ'দুটো বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কথা বলা হলেও আপাততঃ চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার হিমাগারে নিক্ষিপ্ত। কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করে দেং রক্ষণশীলদের সাথে সংগতি রাখছেন

www.nagorikpathagar.com

কারণ তার ধারণা তাদের নীতি এত স্পষ্টভাবে এবং দ্রুত ব্যর্থ প্রমাণিত হবে যে, দু'মাস বা এক বছরের মধ্যে সংস্কার কর্মসূচী পুনরায় পুর্নোদ্যমে চালু করা যাবে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে উদ্ভূত গণঅসন্তোষ দূর্নীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনাই দায়ী। তাইতো সেদিন ১০ লক্ষাধিক বিক্ষোভকারীকে বেজিংয়ের রাস্তায় সমবেত করেছিল।

কৃষি বনাম শ্রমিক কর্মচারী, সংঘাতের কবলে সরকার বনাম শ্রমিক কর্মচারী

গত (১৯৮৮) রিপোর্টে দেখা যায়, সরকারকে কৃষকদের নিকট থেকে শস্য ক্রয় করতে আইওইউ (আমি তোমার নিকট দায়ী)'র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। কারণ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় সেবছর পর্যাপ্ত পরিমাণে চীনা মুদ্রা ছিল না। বছর গড়িয়ে ১টি বছরের সময় অতিক্রান্ত হয়, সাথে সাথে অনেক কিছুরও পরিবর্তন হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তো অনেক ব্যাপারেই সমালোচনার সম্মুখীন চীন। তাই ১৯৮৯'র শেষের দিকে ফসল সংগ্রহে চীনা সরকারের তেমন সংগতি আছে বলে মনে হয়নি। প্রথমত ১৯৮৯ সালে আইওইউ'র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে কৃষকরা হয়তো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। সে প্রেক্ষাপটে এমনও হতে পারে খাদ্যশস্য নিজেরা বেশী পরিমাণে আহার করে, পশুদের দ্বারা খাইয়ে এবং সংকট সৃষ্টির জ্ঞাতার্থে মজুদ করে পরে চোরাচালানী বা খোলা বাজারে নিয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে বিগত বছরে অধিকাংশ কৃষকই তাদের পাওনা পায়নি। তাই সরকারকে বাধ্য হয়ে যদি কাগুজে মুদ্রা ছাপাতে হয় তাতে করে মুদ্রাস্ফীতি চরমাকার ধারণ করতে পারে। আর এখানেই দ্বিতীয়ত ভুক্তভোগী হবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খেটে খাওয়া মেহনতী শ্রমিক কর্মচারী। অর্থনীতির সাধারণ ধারণায় এমন অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীদের আয় হ্রাস পেয়ে যাবে। অবস্থার বেগতিকে সরকারকে অনেক কিছু চিন্তা–ভাবনা করতে হবে। সংঘর্ষ যেখানে অনিবার্য সেখানে সরকার জোরপূর্বক সামরিক কায়দায় টিকে থাকতে পারে, তবে বেশীদিন নয়। শস্য চাষাবাদেও বিশেষিতকরণ হতে পারে। কারণ চীনে শাকসব্জি বা ফলমূলের চাষাবাদ অধিকতর লাভজনক। কৃষকরা শাকসব্জি বা ফলমূল চাষাবাদে বিপ্লব ঘটালে সে ক্ষেত্রে পাক–ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসিত সময়ের নীল চাষের মত অবস্থা হতে পারে। চীনে যে পরিবেশ পরিস্থিতি বা সময় গড়িয়ে যাচ্ছে তাতে অবিশ্বাসযোগ্য নয় যে, ঘটনা তেমনটি ঘটতে পারে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র–শ্রমিকের যে রক্ত বয়ে গেল তার প্রভাব তো অদূর ভবিষ্যতে রয়েছেই।

পশ্চিমা অর্থনীতিবিদগণ আশংকা করেন যে, ডিসেম্বর (১৯৮৯) নাগাদ চীনের প্রবৃদ্ধির হার শূন্যের কোটায় নেমে আসতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার পৌছাতে পারে ১০০–এর ঘরে। বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ১২ বিলিয়ন ডলারে বলে আশংকা করা হয়। ১৯৮৮'র তুলনায় এ অংক শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। সাম্প্রতিক ঘটনায় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণও

www.nagorikpathagar.com

উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেন। খুব শীঘ্রই হয়েতো চীনা অর্থনীতিতে ধস নাম শুরু হতে পারে যদি বিকল্প সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ না করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক চীন কৃচ্ছতাসাধনের ঘোষণা

চাপে পড়লে বাঘে মহিষে এক ঘাটে যেমন পানি পান করে। তেমনি একটা দশা চীনে বিরাজ করছে। পুরোপুরি অর্থনৈতিক মুক্তির দিগন্তে পৌঁছে যাবে মার্ক্সবাদের তথা মাওবাদের ঘোষণা এমনি থাকে সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রারম্ভিক দিকে। চীনের জন্মলগ্নের প্রারম্ভে মাওবাদী প্রবক্তাগণের অনেক আশা ভরসার বাণী ছিলো। কালের আবর্তে সমাজতান্ত্রিক বন্ধুদেশের শিক্ষার জন্যই হয়তো সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক চীনের যখন বারটা বাজা শুরু হয়েছে তখনই স্বৈরতান্ত্রিকভাবে হলেও নীতি নির্ধারণী পরিবর্তন, সংস্কার ও কৃচ্ছতাসাধনের মত, পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। ১৯৮৯ সালেই চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের এনপিসি'র উদ্বোধনী অধিবেশন বেশ রুদ্ধদ্বারভাবেই হয়ে গেলো। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাটছাঁট এবং অর্থনীতির উপর কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণস্বরূপ শ্লোগানটি এমন কৃচ্ছতা ও ত্যাগ স্বীকার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৯৮৯-তে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় ১৫٪ ভাগ বৃদ্ধি করে ৩৭৪০ কোটি আর এমবি'র সমপরিমাণ ১০৫০ কোটি ডলার, কৃষি ক্ষেত্রে সাহায্য ১২٪ ভাগ বৃদ্ধি করে ৪৮৮৫০ কোটি ডলার এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ তহবিলও ১৯৮৮'র ব্যয় থেকে ১৩٪ বৃদ্ধি করে ৭০১৮৭ কোটি ডলারের কথা ঘোষণা করা হয় কৃচ্ছতাসাধনের ব্যাপারে চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেং-এর ভাষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি গণ মুক্তি বাহিনীর প্রতি অব্যাহতভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক স্বার্থের অধীনস্থ থাকার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা মূল্য সংস্কারকে স্বীকৃতি দেই অথচ রাষ্ট্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও জনগণের সহিষ্ণুতাকে সম্পূর্ণ ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। লী বলেন, পুনর্বিন্যাসকালে সরকার ও জনগন উভয়কেই আগামী কয়েক বছরের কৃচ্ছতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন, আমরা যদি ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করি এবং জনগণের কাছে কঠোরভাবে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরি তবে তারা অবশ্যই এটা বুঝতে পারবেন ও সমর্থন করবেন।

জিএনপি প্রবৃদ্ধিতে দেখা যায় ১৯৮৮ সাল নাগাদ সরকারীভাবে ছিল ১১٪ ভাগের কিছু বেশী, পক্ষান্তরে শিল্প উৎপাদনও প্রায় ২১٪ ভাগে দাঁড়ায়। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত প্রবৃদ্ধিই পরপর কয়েক বছরের দ্রুত শিল্প প্রবৃদ্ধির কারণ কিংবা ১৯৮৮'র ১৮٪ ভাগের সামান্য মুদ্রাস্ফীতির জন্য অনেকাংশে মাত্রাতিরিক্ত (ভাগ) পণ্য সংক্রান্ত তহবিল দায়ী।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে চীনা জনগণ দীর্ঘস্থায়ী কৃচ্ছতার পরিস্থিতি মেনে নিবেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়। দেশের বিভিন্ন খন্ডিত শক্তিশালী আঞ্চলিক ও আমলাতান্ত্রিক স্বার্থান্বেষী মহল তাদের লাভের হিস্যা হ্রাসের বিষয় ও অর্থনৈতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে রাজি নন।

www.nagorikpathagar.com

এমন আভাস পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে লী'র সতর্কবাণীতে কঠোর হুশিয়ারি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৯ পর্যন্ত ১৮ হাজার প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। অর্থনৈতিক মন্দার কথা উল্লেখ করে জনৈক অর্থনীতিবিদ বলেন, ১৯৬০'র দশকের প্রথমভাগে পরিস্থিতি যখন মন্দা ছিল তখন সকলেই ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হন, এ ক্ষেত্রে মহান মাওসেতুংও পরিত্রাণ পাননি। তিনি দেখিয়েছেন, সে সময় মনস্তাত্ত্বিক সহনশীলতা বেশী ছিল, কারণ পার্টি প্রকৃতই জনগণের আপদ-বিপদের অংশীদার হয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে (১৯৮৯) কমরেডগণ বিলাসী জীবন-যাপন করেন, তাদের ভোগ-বিলাস কাটছাঁট করারও কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণই যথেষ্ট, বেইজিং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্র লিকিয়াং কখন থেকে তার দেশে কোথাও ভুল চলছে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে তার কথা স্মরণ করেন। চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক সরকারী কর্মকর্তার পুত্র ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য লি' স্মরণ করেন, "লোকেরা সব সময় আমাদের উপহার সামগ্রী পাঠায়,এর মধ্যে রয়েছে ভালো ভালো খাবার, টিভি সেট ইত্যাদি। এগুলোর জন্য আমাদেরকে পয়সা-কড়ি দিতে হয় না। গত মাসে (১৯৮৯) আমরা একটা নতুন ভিডিও পেয়েছি। এ নিয়ে আমাদের তিনটি ভিডিও হল। যতদিন আমি বাড়ীতে ছিলাম ততদিন এগুলোকে আশ্চর্য কিছু মনে হত না। বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখনই আসল ব্যাপার অনুধাবন করলাম এবং বুঝতে পারলাম সরকার এভাবে চলার কথা নয়। সেবার গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আমার বাবা আমার সামনে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন, আমরা হোটেলে গেলাম এবং একটি পার্টি খেলাম, কিন্তু পয়সা দিলাম না; হোটেল ম্যানেজার পয়সা নিলো না কারণ সে আমার বাবার কাছে কৃতজ্ঞ; বাবা ম্যানেজারের বাড়ী বানাতে তাকে সরকারী অর্থ পাইয়ে দিয়েছেন। " লি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো কেন তিনি পয়সা দিলেন না" তিনি জবাব দিলেন, এটাই হচ্ছে, এখন চীন। চীনা সমাজে রন্ধ্রে বন্ধ্রে না হলেও এমনি বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়ারা বিরাজমান। চীন ১৯৮৯ পর্যন্ত ৫ বছরের অর্থনৈতিক বিস্ফোরণ অবস্থা থেকে নেমে এসেছে। ১৯৮৩ -৮৯ পর্যন্ত মেয়াদে বার্ষিক শিল্প প্রবৃদ্ধি বছরে গড়পড়তা ১৪% ভাগের ও বেশী ছিল। তা জ্বালানী পরিবহণ অবকাঠামো এবং প্রধান কাঁচামালের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়। এটা বলা সম্ভব নয় যে, বিগত ৩ মাসের উল্লিখিত শিল্প প্রবৃদ্ধিতে মন্থরতার জন্য নতুন কৃচ্ছতার নীতি কতটা দায়ী। লী'র রিপোর্টে যেমন দাবী করা হয়েছে। অথবা বিদ্যুৎ শক্তি ও কাঁচামালের বর্তমানের সংকট এর কারণ কি না। একটা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮৮ সালে কলকারখানায় সপ্তাহে ৫দিন আবার অধিক সংখ্যা কলকারখানায় সপ্তাহে ৩ দিন পর্যন্ত কাজ করেছে শ্রমিকরা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থাটি কেমন। যৌথ ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্রুত প্রবৃদ্ধি মোট শিল্প উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অংশ ব্যাপকভাবে হ্রাস করে। ১৯৮৯ থেকে আগের দশকে ৮০% ভাগ থেকে ৬৪% নেমে আসে।

লী এক পর্যায়ে বলেন, বিনিয়োগ ঋণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কর ধার্য ও মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষুদ্র সামর্থ্যের লোকদের চাইতে অধিক সামর্থ্য সম্পন্নদের সুযোগ দেবার নীতি

www.nagorikpathagar.com

অনুসরণ করবো। তাদের সহায়তা করবো যাদের হাত মজবুত করা প্রয়োজন। যাদের সুযোগ খর্ব অথবা নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন তাদের উপর বিধি নিষেধ আরোপিত হবে। লী আর ও বলেন, আমরা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো যুক্তিসঙ্গত করতে এবং সম্পদের সর্বাধিক বরাদ্দে সক্ষম হবো। কৃচ্ছাতা সাধনের কর্মসূচী কত নির্মম ও দুরুহ যে, তা নিম্নের ওপরের সংক্ষিপ্ত কথায় বুঝা যায়। কৃচ্ছতার কর্মসূচী প্রচ্ছন্নভাবে শহরে বাসিন্দাদের অন্ততঃসরকারী কর্মচারীদের চাকুরী, আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। গ্রামীণ খাত শহর তলীতে এবং পল্লী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরীচ্যুতদের এবং সেই সঙ্গে কয়েক মিলিয়ন চুক্তি বদ্ধ শ্রমিকদের যারা শহরের নির্মাণ কাজ হারিয়েছে তাদের আত্মস্থ করবে তাদের গ্রামে ফিরে যেতে বলবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যর্থতার পর বেসরকারী উদ্যোগের এক দশকের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সমাজতন্ত্র নামক ঘুনে ধরা এক সমাজ ব্যবস্থা চীনকে অর্থনৈতিক অধোগতির দিকে নিয়ে যায়। চীনের মানুষ যেমন বন্দী খাঁচায় আবদ্ধ বাকস্বাধীনতা রুদ্ধ প্রায় উর্ধতন কমরেড মহলে নিভৃত চরম হতাশা বিরাজ করছে, আজ (১৯৮৯)থেকে বছর ১১ পূর্বে কিছুটা রোধোদয় হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে চীন ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। বিগত দশ ১৯৭৮–৮৮ বছরের চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্যের যে রিপোর্ট তা বেইজিং রিভিউ পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। ১৯৮১ সাল থেকে চীনে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ এবং এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচীর সংখ্যা বছর বছর বাড়তে থাকে। বেকারত্বের কিছুটা উপশম হয়েছে। ১৯৮৩–৮৭ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকলপনায় দেখা যায় শহরে কর্মচারীদের মধ্যে বেশীর ভাগ কর্মচারীই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রায় ৪২ লাখ ২০ হাজার চাকুরীজীবির বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মসংস্থান হয়েছে। ১৯৮৭ সাল নাগাদ রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারী যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠান সমূহে শতকরা ১৬·৪ ভাগ হল বেসরকারী পর্যায়ে। পত্রিকার রির্পোর্টে বলা হয়, ১৯৮৭ সালের শেষ নাগাদ চীনের শহর এলাকার ৪৮ কোটি ৭০ লাখ শ্রমিকের অধিকাংশই এসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। এর মধ্যে ৮ লাখের মত শ্রমিক শিল্প ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে। গ্রাম এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংখ্যা ১৯৮৬ সালে ১৩ লাখ ৯ হাজার থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৮৭ সালে ১২৬৩৵ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ৬৬ লাখ ৬০ হাজারে দাঁড়ায়। মোট জাতীয় উৎপাদনের বেলায় ও দেখা যায় ১৯৭৮ সালে যেখানে সাড়ে ৩৭ হাজার কোটি ইউয়ান ছিল তা ১৯৮৭ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ২২৪৵ ভাগ বেড়ে ৮৪ হাজার কোটি ইউয়ানের উপর।

পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, শহর ও গ্রামাঞ্চলের এই আয় নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান তাদের লভ্যাংশের অধিকাংশই আবার

www.nagorikpathagar.com

বিনিযোগ করে। তারা একদিকে যেমন তাদের শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে, অন্যদিকে অধিক থেকে অধিকতর শ্রমিক নিয়োগ করতে থাকে। এই নিয়োগ প্রাপ্ত লোকজনের অধিকাংশই বঞ্চিত মানুষ।

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত চীনের বৈদ্যতিক উৎপাদন শতকরা ৪১ ভাগ এবং শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৭৬ শতাংশ। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বেসরকারীখাতে পুঁজি নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে চীনের এই অর্থনৈতিক অগ্রগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

১৯৭৮–৮৭ সময় চীনের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টন বেড়ে যায়। এই পরিমাণ বিশ্বের মোট খাদ্যোৎপাদনের ৫১·৮ শতাংশ। ১৯৭৮ সালে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৯·৫ শতাংশ কম খাদ্যশস্য উৎপাদন করে এবং ১৯৮৭ সালে এই উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৩০·৭ শতাংশ বেশী হয়। ১৯৮৭ সালে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় চীনের উৎপাদন ছিল ১৬·৭৯ শতাংশ এবং মাথাপিছু উৎপাদন ছিল বিশ্ব পরিমানের ৭৫·৩ শতাংশ। ১৯৮৭ সাল নাগাদ হয়ে যায় যথাক্রমে ২০·৫৬ শতাংশ এবং ৯৩ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের হিস্সা ক্ষুদ্র হলেও গত দশ বছরে বেসরকারী খাতকে উৎসাহদানের প্রেক্ষাপটে দেশটির অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট বাণিজ্য ২৮ তম স্থান থেকে দ্বাদশ স্থানে রফতানী বাণিজ্যে ৩২ তম স্থান থেকে চতুর্থদশ স্থানে এবং আমদানীতে ২৭ তম স্থান থেকে একাদশ স্থানে উন্নীত হয়।

উক্ত পত্রিকায় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হয়, উন্নত বিশ্বের সাথে চীনের যে বিশাল অর্থনৈতিক শূন্যতা ছিল তার প্রধান কারণ ছিল পুঁজিবিনিয়োগে অব্যবস্থা, জনশক্তি আর সম্পদের অপব্যবহার ও অব্যবহার। দীর্ঘ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত সংস্কারের ফলে চীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু চীনের এখনো অর্থের বড় অভাব। উন্নয়ন ক্ষেত্রে দক্ষজনশক্তির অভাব এখনো প্রকট। দশ বছর আগেকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গত দশ বছরের অগ্রতির তুলনা করলে এবং অন্যান্য দেশের উন্নয়নগতির সাথে এর তুলনা করলে আশার আলোই স্পষ্ট হয়, সংস্কার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে সাড়া মেলে।

চীন, ধুমায়িত থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এক বাস্তবতা

নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বহির্বিশ্বে তেমন একটা আধিপত্যবাদ পরিলক্ষিত হয়নি। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনঅধ্যুষিত চীনের ১৯৮৯ সালে জনসংখ্যা ছিল প্রায় একশ' দশ কোটি। নিজের ঘর সামলতে গিয়ে বিশেষ করে সর্বাঙ্গীনভাবে ন্যূনতম অর্থনৈতিক

www.nagorikpathagar.com

ব্যয় নির্বাহ করার নিমিত্তে ব্যস্ত। সমাজতন্ত্রের দেশ চীন বেশী দিন অতিক্রান্ত করতে না করতেই পশ্চিমী হাওয়ার কবলে পড়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি বাচনে-ভঙ্গিতে যতই তারা সমাজতন্ত্রের বুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক না পেটে যেখানে ক্ষুধার তাড়না রয়েছে সেখানে তাদের স্থান হিসেবে পশ্চিমী দুনিয়া স্পর্শ করেছে। ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সননের চীন সফর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ওয়াশিংটন বেইজিংয়ের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। মাঝে মাঝে ওয়াশিংটন চীনের পক্ষ থেকে কথার ফুলঝুরি ছড়াত; কিন্তু ব্যাপার কদ্দুর গড়াতে দেখা যায় সে বিষয়ে চীনাদের বেশ টনটনে জ্ঞান ছিল। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ওয়াশিংটন ও বেইজিয়ের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এতে করে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায়ের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়

প্রেসিডেন্ট রিগ্যান, নিক্সন, কার্টার নীতিমালা অসময়েই অনুমোদন করেন। এতে অন্ততঃ চীনারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সাথে গঠনমূলক আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে, এতে করে চীনাদের বিপজ্জনক অস্থিতিশীলতা বদনাম ঘুচে যায়। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে যে বদনামের ভাগীদার হয়েছিল, তা নতুন চীনা নীতির ফলে তার সেই লুপ্ত মর্যাদা অপ্রত্যাশিতভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। চীন-মার্কিন সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে মার্কিন-চীনা কর্মকর্তাদের সফর বিনিময় এক অভিন্নমত পোষণ করা হয় এবং এ সমস্ত সফর বিনিময় কম্যুনিষ্ট চীনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে পরোক্ষভাবে সাড়া দেয়। পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে হলো? ইতিপূর্বে বেসরকারীকরণে, কৃচ্ছতাসাধন, অর্থনীতি সমাচার এবং শ্রমিক-কর্মচারী বনাম কৃষি ও সরকারের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যাপারে কিভাবে পর্যায়ক্রমে ধূমায়িত হলো, সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রতিপন্ন করা যায়। এ ছাড়াও গণতন্ত্র পদদলিত, মানবাধিকারও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার হরণ, সমাজের রন্ধ্রে দুর্নীতি ইত্যাকার বিষয়গুলো চীনা সমাজের জাগ্রত ছাত্র জনতাকে ক্ষেপিয়েতুলে।

কম্যুনিষ্ট চীনের দেং প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করে এক ছাত্র বলেন,"আমি যখন স্কুল ছাত্র তখন ১৯৭৮ সালে দেং কৃষি সংস্কার কর্মসূচী প্রবর্তন করেন। কৃষকদেরকে তাদের জমি ফিরিয়ে দেয়া হল। তখন দেংকে ভালবাসার জন্য আমাদের শেখান হল এবং সত্যিই আমরা তাকে ভালবাসলাম। এবার বাড়ী গেলাম, কিন্তু আমার কৃষক পরিবার আমাকে ঠিকমত চারটে ভাত দিতে পারল না। এটা যদি কম্যুনিষ্ট দেংয়ের ত্রুটি না হয়ে থাকে তা হলে দোষ দেয়া যায় কাকে?

গণতন্ত্রের ব্যাপারে তারা যে হীনমন্যতায় ভুগছে তার একটি ঘটনায় দেখা যায়, ১৯৮৭ সালে পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচনে সরকার প্রথমবারের মত একাধিক প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেন। ফলস্বরূপ বেশ কয়েকজন কট্টপন্থী শীর্ষ নেতা পরাজয় বরণ করেন।

www.nagorikpathagar.com

এরপর থেকে পার্টি নেতৃবৃন্দ চীনা বৈশিষ্ট্যের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন। তারা বলেন, পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক সংস্কার চীনের জন্য উপযোগী নয়। এ বক্তব্যের জবাবে একজন জ্যোতির্বিদ ও চীনের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ফাং লি ঝী বলেন তারা সর্বদা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন, কিন্তু ইহা একটা অর্থহীন ব্যাখ্যা। গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন আদর্শ।

সম্প্রতি চীনা নেতৃবৃন্দ মানবাধিকার প্রশ্নে নিজের লোকদের নিকট থেকেই ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন। ক'মাস পূর্বে জাতীয় গণকংগ্রেসের বৈঠকের পূর্বে রাজবন্দীদের ক্ষমা করার দাবী জানিয়ে বহু শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের নিকট তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র প্রদান করেন। তারা বিশেষভাবে এক দশক পূর্বে 'গণতন্ত্র প্রাচীর' আন্দোলনকালে কারারুদ্ধ শ্রমিক ইউজিং শেং-এর কথা উল্লেখ করেন। সরকারের সমালোচনা করে শ্রদ্ধাভাজন বুদ্ধিজীবীদের এধরনের প্রকাশ্য বিবৃতি এটাই প্রথম। কর্তৃপক্ষ এ দাবী যুক্তিতে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বুদ্ধিজীবীরা অবৈধভাবে চীনের আইনগত প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছেন। বেইজিং সর্বদা চীনের মানবাধিকার সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরতে বিদেশের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ কর। ১৯৮৯'র ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ চীন সফরকালে ফাং-লি ঝিকে বেইজিং-এর একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানালে পুলিশ তাঁকে সেখানে যেতে দেয়নি।

চীনের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন চক্রনীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রভাব খাটান একটি কট্টরপন্থী দল। চীনের অত্যাধিক মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাদের হাতকে আরও শক্তিশালী করে। তারা এখন এ যুক্তি দাঁড় করানোর সুযোগ পেয়েছেন যে, দেং-এর সংস্কার উদ্যোগ ব্যর্থ। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মকর্তা বলেন, এখন তাদের সমালোচনা ও কথা বলা অনেক সহজ। কেননা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখন বিশৃংখল।

দেশের অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতাই রুদ্ররোধে ফেটে পড়ে। চীনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাইতো ১৯৮৯ সালে চীনে রক্তের হোলিখেলা বয়ে গেলো। আর অনেক দিন ধরে চাপা নির্যাতন নিষ্পেষণের খবর পাওয়া যায়। গণমানুষের নতুন জোয়ার বইছে বলে বেইজিং-এর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীরা জেগে উঠে। তারা পোষ্টারিং করে "গণতন্ত্র চাই" মানবাধিকার চাই' আরো চাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। আর এ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, ১৫ই এপ্রিল জনপ্রিয় সংস্কারক ক্ষমতাচ্যুত কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান হু' ইয়াও ব্যাংয়ের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। এই বিক্ষোভ মিছিল ১৯৪৯'র পর ক্ষমতাসীন চক্রের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বিক্ষুব্ধ মিছিলকারী ছাত্রসমাজ কম্যুনিষ্ট চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদেরই সন্তান। তারা চীনের সামগ্রিক আমূল পরিবর্তন চায়। তারা দাবী জানায় গণতন্ত্র, মানবাধিকারও অবাধ স্বাধীনতা সংবাদপত্রের। ১৯৮৯'র ছাত্র বিক্ষোভ আন্দোলন ১৯৮৬-৮৭'র তুলনায় তীব্রতর ছিল। সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে তিয়েনানমেন স্কোয়ারে দেড় লাখ ছাত্র একরাত কাটিয়ে

www.nagorikpathagar.com

দেয়। বিক্ষোভ চলাকালে ছাত্রদের চতুষ্পার্শ্বে চীনা সৈন্যদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে একজন ছাত্র বলে, সময় আসলে এরা আমাদের পাকড়াও করবে। ছাত্রদের বিক্ষোভ দমনার্থে স্বৈরাচারী কম্যুনিষ্ট সরকার জনপ্রিয় পত্রিকা দি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক হেরাল্ড–এর একটি সংখ্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কারণ এ সংখ্যা মেহনতী জনতার মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করা হয়।

বহুসংখ্যক ছাত্রই পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, পশ্চিমা গণতন্ত্রকামী সরকার বা নেতৃবৃন্দ কি করেন। এক পর্যায়ে এক ছাত্র দুঃখ করে বলে যে, সে পত্রিকায় পড়েছে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বব হক স্বীকার করেছেন যে, তিনি মদ্য পান করেছেন এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন।" অন্য আরেকজন ছাত্র এ প্রেক্ষাপটেই বলেছে যে, আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তাদের নেতারা এমনতর স্বীকারই করবেন না। পরবর্তীতে ছাত্র বিক্ষোভ প্রচন্ডাকার ধারণ করে এবং বেইজিং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টার লেখা ছিল, প্রধানমন্ত্রী লিপেং গদী ছাড়" দেং জিয়াও পিং–তোমার সময় হয়ে এসেছে।"

হু'র মৃত্যুর পর হাজার হাজার ছাত্র শ্রমিক জনতার তিয়েনানমেন স্কোয়ারে থেকে যান। প্রধানমন্ত্রী লী' তাদের সাথে কথা বলবেন না এই ধারণায় একজন ছাত্র আক্ষেপ করে বলেন, প্রয়োজনে আমরা তিয়েনানমেন স্কোয়ারে রক্ত দিতে প্রস্তুত। এর মধ্যে তারা সাত দফা দাবী–দাওয়া জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ ও প্রচার করে। এর মধ্যে রয়েছে চীনা নেতাদের আয় সাধারণ্যে প্রকাশ, বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার প্রদান, শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ ও সংবাদপত্রের আরও স্বাধীনতা প্রদান। ছাত্রদের ক্ষুব্ধ হবার কারণ, তারা তাদের সত্য খবরটির জন্য ভয়েস অব আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্যই তারা সোচ্চার হয়ে উঠে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই চায় সরকার ও জনগণের মধ্যে এক ধরনের মত বিনিময় হোক। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে একজন ক্রুদ্ধ ছাত্র তো চীৎকার করে বললো, আমরা ৪০ বছর ধরে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার অধীনে এবং আমরা এখনও নরকে বাস করছি।

রুশ প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের সফর আসন্ন। আন্দোলন চলছে, চলছে তিয়েনানমেন স্কোয়ারে অনশন। এটা ১৩ই মে ১৯৮৯'র ঘটনা। ইতিমধ্যে গর্বাচেভের চীন সফর প্রচন্ডভাবে ধাক্কা খায়। শেষাবধি রুশ প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, চীনা ছাত্রদের মাথা গরম। তিয়েনানমেন স্কোয়ার ছাত্রদের দখলে থাকায় মিঃ গর্বাচেভকে বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। চীনা কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ছাত্ররা সাহসের সাথে তিয়েনানমেন স্কোয়ার দখল করে রাখে। তবে ঠিক এ সময় চীনা নেতৃবৃন্দ অত্যাধিক ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবিলা করলেও পরবর্তী ঘটনায় চীনকে সারা বিশ্বে তার কৃতকর্মের জন্য খেসারত দিতে হয়।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের আন্দোলন শুধুমাত্র বেইজিংয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়ে সাংহাই, নানজিং তিয়ানজিন ক্যান্টন ও অন্যান্য স্থানে। যোগ দেয় কৃষক–শ্রমিক শিক্ষকসহ

www.nagorikpathagar.com

সর্বস্তরের জনগণ। এই জনগণের গণআন্দোলন চীনের নেতৃত্বে চরমভাবে আঘাত হানে। মূলতঃ কোণঠাসা করে ফেলে। ছাত্রদের অনশনরত অবস্থায় অনেকেই সংকটজনক হলে পর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদের বৃষ্টির মধ্যে অবস্থানরত অবস্থায় দেখে মিঃঝাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলে ফেলেন, আমি তোমাদের নিকট আসতে খুব বিলম্ব করে ফেলেছি।' কিন্তু অহংকারী কট্টরপন্থী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লী পেং অল্প সময় ছাত্রদের মাঝে অবস্থান করে চলে যান। এর পর ঘটনা গড়িয়ে আরও এগিয়ে যায়। ইতিপূর্বে সেনাবাহিনী প্রথম দিকে সরকারী নির্দেশ পালনে বেশ কিছুটা গড়িমসি করে। সেনাবাহিনী পরোক্ষভাবে ছাত্রদের আন্দোলন স্থগিত করতে সময় দিলে ছাত্ররা আইন অমান্য করতে থাকায় ছাত্রদের সমর্থনে কৃষক শ্রমিকসহ লাখ লাখ সাধারণ মানুষ তিয়েনআনমেন চত্বরে সমবেত হতে থাকে। প্রায় ৩হাজার ছাত্র অনশন শুরু করে দেয়। তাইওয়ানের ঘটনায় প্রমাণ মেলে বিশব্যাপী চীনা ছাত্রদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে ২৪০ মাইল লম্বা 'মানব শৃংখল' ১০ লাখ জনতার হাতে হাত ধরাধরিতে ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরী করা হয়। তাইওয়ানবাসীরা শুধু তা থেকেই ক্ষান্ত হননি বরং যারা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সাহস জুগিয়ে চিঠি লিখতে চায় তাদের মধ্যে ১৩ লাখ পোস্টকার্ড বিলি করে। যে ১০ লাখ লোকের সমাবেশ তিয়েনআনমেন চত্বরে হয়ে গেল তা কম্যুনিষ্ট চীনের ৪০ বছরের ইতিহাসেবিরল।

২ রা জুন,১৯৮৯-এর এমনি একদিনে সরকারী হুকুম পালনে সেনাবাহিনী শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর বিনা উস্কানিতে সহসাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবুও সৈন্যদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের তর্জন-গর্জনের মধ্যেও ছাত্ররা বিক্ষোভকারীদের প্রশমিত করার জন্য হিংস্র না হওয়ার জন্য বার বার আহবান জানাতে থাকে। এতবড় ভয়াল বৃহত্তম মিছিল-সমাবেশের মাঝেও ছাত্ররা অত্যাধিক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। ছাত্ররা ভাংচুর, লুটতরাজ, অনিয়ম ও উচ্ছৃংখলতার পরিচয়ও দেয়নি। এটা চীনের আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত।

ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তারা অটল ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল জুনে (১৯৮৯)। পার্লামেন্ট অধিবেশনের প্রথম দিনের অধিবেশন শেষে নির্ধারিত চত্বর ত্যাগ করে। এরই মধ্যে চীনের ইতিহাসে পূর্বের রক্তপাতের ঘটনার অনুরূপ কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো চীনা সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী। তারা হত্যা করলো তাদেরই,রচনা করলো নতুন ইতিহাস। তাইতো জুনের ৩-৫ পর্যন্ত ১৯৮৯'র দিনগুলোতে কম করে হলেও তিন হাজার লোক নিহত ও ১০ হাজার আহত হলো। স্বৈরাচারী সরকার সৈন্য বাহিনীকে কুকুরের মত লেলিয়ে দিলেও প্রথমদিকে সেনাবাহিনী ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করলেও যথেচ্ছভাবে একতার ভাব প্রদর্শন করতে নমনীয় হয়। তাই তো সে দিন বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখেছে ছাত্র-সৈন্যদের মধ্যে আইসক্রীম ও সিগ্রেট বিনিময়ের ঘটনা। ছাত্রদের সাথে তাল মিলিয়ে সেনা বাহিনীর একটা অংশ সাধারণ পোশাকে মিছিলে যোগ দিয়েছিল এমন খবরও পত্রিকার পাতায় বেরিয়েছে। সেনা বাহিনীর মধ্যে চরমপন্থী ২৭ নং ইউনিট চীনা নেতা দেং শিয়াও পিং'র অনুগত বাহিনী বলে

www.nagorikpathagar.com

খ্যাত এই ইউনিট পাশবিকতার এক নজির স্থাপন করে। ২৭ নং ইউনিটের কার্যক্রমে অন্যান্য ইউনিটগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ফলে পশ্চিম বেইজিংয়ে ২৭ ও ২৮ নং ইউনিটের মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। অপরদিকে দক্ষিণ বেইজিংয়ে সেনা বাহিনীর ইউনিটগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে কম করে হলেও ৩০টি সামরিক যান ধ্বংস ও অনেক সৈন্য নিহত হয়েছিল। শহরতলীর না ইউনিয়ন সামরিক বিমান বন্দরে সামরিক ইউনিটগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে গুলী ছুঁড়ে।

উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহ বয়ে চলে বেশ পূর্ব থেকেই। সমাজতন্ত্রের পতনের লক্ষ্যে থেমে থেমে বন্দুক যুদ্ধ চলে। অথচ পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের পূজারী দেশও নেতৃবৃন্দের মধ্যে এর রেখাপাত নেই। তারা জানায় না নিন্দাবাদ,প্রতিবাদ তো করেই না। অগ্নিস্ফলিঙ্গ চীনা ইতিহাসে স্বাক্ষর বহন করে ও ভবিষ্যতে অনুপ্রেরণা যোগাবে

ঘনীভূত সংকট কি কাটবে?

১৯৮৯ সালে কম্যুনিষ্ট চীনে রক্তপাতের অব্যবহিত পর পরই বহু সংখ্যক ছাত্র নেতাকে পাকড়াও করে বিচার শুরু করে। ছাত্র নেতাদের মৃত্যুদন্ডের খবরও পরপর জানা যায়। অসংখ্য ছাত্রদের বিচার হয় এবং তাহলো মুলত মৃত্যুদন্ডাদেশ জারি করেই। তাই প্রধান নেতা দেং জিয়াং পিং বলেন, দেশে সাম্প্রতিক গোলযোগের কারণ দূর্নীতি, যা কিছু লোককে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর আস্থা হারাতে প্ররোচিত করেছিল। তিনি আন্দোলনের জন্য অভিযুক্তকারীদের বেশী হারে প্রাণহানি না ঘটানোর জন্য সতর্ক করে দেন। তিনি আরো বলেন, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ক্ষমা প্রদর্শনই শ্রেয় হবে। দেং পরামর্শ দেন যে,নতুন নেতাদের উচিত হবে জনসাধারণের আস্থাভাজন হওয়া এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিদের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু কার্যত নতুন নেতারা সেদিকে দিকপাত করেছে বলে মনে হয় না। তারা প্রতিশোধ পরায়ণতায় লিপ্ত। ফি দিনই বিচার করে ছাত্রনেতাদের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকরী করেন, আর বিভিন্ন গুপ্তস্থানে পালিয়ে থাকা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র শ্রমিক নেতাদের হয়রানি এবং আটক করেন। মোট কথায় একটা গুমুটে পরিস্থিতি বিরাজ করে। অন্যদিকে বিদেশে অবস্থানরত চৈনিক সংগ্রামী ছাত্ররাও একীভূত হয়ে আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। ১৯৮৯'র চীনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর যেমন সেনাবাহিনীতে ব্যাপক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তেমনি চীনা নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী ও কট্টরপন্থী দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এতে করে কম্যুনিষ্ট নেতা ঝাও জিয়াং ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তার স্থলে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আসেন পলিট ব্যুরোর কট্টরপন্থী সদস্য কিয়াও শি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন প্রেসিডেন্ট ইয়াং শাংকুন এবং দেং লী পেং। পশ্চিমা কূটনীতিকরা বলেন, চীনা প্রেসিডেন্ট ইয়াং শাংকুনই পশ্চাতে থেকে কলকাঠি নাড়েন এবং তার প্রতি সেনাবাহিনীর সিংহভাগ অংশের সমর্থন থাকে।

www.nagorikpathagar.com

ছাত্র-জনতার মাঝে যখন গুলী চালানো হয় তখন স্বভাবতঃই সেনাবাহিনীর মধ্যে উষ্ণ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। কারণ ছাত্র জনতা যে তাদেরই ভাই, ভাতিজা, চাচা বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। আবার মানুষ হত্যা সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর সদস্যও নিহত হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটেই সেনাবাহিনীর মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা যে কোন সময় বিস্ফোরণোন্মুখ হতে পারেন। আর তাই যদি দৈবাৎ কারণে হয়ে যায় তবে নেতৃত্বেরও ব্যাপক পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। অনেকের ধারণা, প্রচুর রক্তপাতের পর নতুণ বিপ্লব সাধিত হতে পারে। এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে, ব্যাপক ওলট-পালটের পর সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের শেষ আবেদনটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠিত হবে হয়তো নতুন শাসন ব্যবস্থা।

রক্তপাতের ঘটনায় চীন অনেক বন্ধু দেশকেই হারাতে বসে। যেমন করে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ চীনের সামরিক অভিযানকে 'গনহত্যা' 'নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ' হিসেবে আখ্যায়িত করে তীব্র সমালোচনা করে। এবং চীনে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ ঘোষণা করে। শিল্পোন্নত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। বন্ধু দেশসমূহ তাদের কূটনীতিকদের প্রত্যাহৃত করেন। তারা তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রুশ-ভারত লবী ঘটনার নিন্দা তো জানায়নি বরং আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টা করে। অথচ রুশ-ভারত লবীতে সরকার যাই বিবৃতি প্রদান করুক না কেন জনতার তীব্র নিন্দা ছিল চীনের ঘটনায়। ঘটনায় এমন প্রতীয়মান হয় সোভিয়েত তার প্রভাব বলয়ে হয়তো চীনকে বাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। এবং চীনের তথাকথিত নেতারা এমন একটি ফাঁদে পড়তে পারেন, কিন্তু তাহবে সাময়িক কালের জন্য। কারণ কতিপয় সমস্যাই ভারী হয়েছে। তাই কি করে সম্ভব রুশ চীনকে কাছে টেনে নিয়ে সমূহ বিপদে পড়ার।

চীনা সংকটের অবস্থানগত দিক দিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহ পর্যবেক্ষক অবস্থানে নেই, কারণ তারা জানে তাদের নিকট চীনের ধর্ণা দিতেই হবে তা আজ হোক আর কাল হোক। গত ১৯৭৮ সাল থেকে বেসরকারীকরণের কিছু পদক্ষেপের স্বাদ তারা যে চীনা জনগণের মধ্যে পাইয়ে দিয়েছে তাকি সহজে চীনা জনগণ ভুলে যাবে? আর ইতিমধ্যে বিগত দশ বছরে চীনের যে সাফল্য বিভিন্ন সেক্টরে চীনা সরকার তথা সামগ্রিক ছাত্র-জনতা মাত্রা ভাল করেই জানে। সুতরাং এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশ সমূহের জন্য এটা একটা বোনাস হিসেবে কাজ করে।

চীনা সরকার স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকা নিলে তার স্থায়িত্বকাল হবে সামান্যতমই। ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ আন্দোলন মনে হয় বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু এর ভাবমূর্তি ধরিে ধীরে চড়াই উৎড়াই করেই এগুচ্ছে। সত্যিকারার্থে যেদিন বিস্ফোরণ ঘটবে সেদিনই কম্যুনিষ্ট চীনের কম্যুনিষ্ট স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটবে। চীনের সাধারণ জনতা স্বাভাবিকভাবেই আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তে পা বাড়াবে। সেখানে রুশ-ভারত লবীর কোন কিছু বলার থাকবে না। আর এগিয়ে এসেও লাভ হবে না। সেদিনই হবে চীনা জনগণের মুক্তি।

www.nagorikpathagar.com

দুই বৈরী দেশের সম্পর্ক সমাচার

সঙ্গত কারণেই চীন–রুশকে দুই কম্যুনিষ্ট পরাশক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলতে বাধা নেই যে, তারা সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমকে একমাত্র মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। দু'দেশের মধ্যে একদা মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হলো, পূনবৈরিতা এবং শেষতঃ শীতল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের (৩০ বছরের) তিক্ততার অবসান ঘটলো।

নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতা লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করা হয়। ক্ষমতা পোক্ত করে বিশ্বের এদিক সেদিক চোখ রাঙাতে ও সুযোগ খুঁজতে থাকে, কিভাবে কম্যুনিজম বা সমাজতন্তবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার করা যায় এবং তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে রাশিয়া কসুর করেনি। ৫০এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক দেশকেই তার কব্জায় নিয়ে যায় এবং অনেক দেশেই প্ররোচনা চালিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিস্থাপনে চেষ্টা চালায়।

ঘটনা স্বরূপ ১৯৪৯ সালে চীনে মাও সেতুং–এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয় ঠিক এমনি সময় অর্থাৎ ১৯৫০সালে সুযোগ সন্ধানী রাশিয়া আধিপত্যবাদ বিস্তারের লক্ষ্যে চীনের সাথে চির মৈত্রী ও শান্তির চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু সে চির মৈত্রী চুক্তি অতি অল্প সময়েই বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে যায়। চীন চায়নি রাশিয়া তার উপর খবরদারি করুক। প্রয়াত স্ট্যালিনের পর পরই ১৯৫৬ সালে সমাজতন্ত্র বাদের সম্পর্ক নিয়ে অবনতি ঘটে। ঠিক ১৯৫৮ সালে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ শুরু করে। যেমনটি সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ চীনের কমিউন আন্দোলন এবং "গ্রেট লীগ ফরোয়ার্ড" শিল্পনীতিকে প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন তেমনটি মাওসেতুং সোভিয়েত নীতিকে সংশোধন বাদ ও মার্কসবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলে সমালোচনা করেন। চীনের আরো অভিযোগ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আধিপত্যবাদী মনোভাব চরম রূপ নিচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তলে তলে পরাশক্তি হয়ে উঠছে। এবং তৃতীয় বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রবল প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একেত সোভিয়েত চীনের সীমান্ত সংযোগ ৪ হাজার ৫শত মাইল রয়েছে তার উপর কিছু বৈরিতা শুরু হয়েছে তাই যুদ্ধের আশংকা করাই সঙ্গত কারণ ছিলো। শেষাবধি ১৯৬০ ও ৭০'র দশকে এ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হওয়ার বাকী থাকলো না। ১৯৬০ সালে রাশিয়া চীনে কর্মরত সোভিয়েত কারিগরদের প্রত্যাহার করার কাজ শুরু করে। ১৯৬৩ সালে চীন–সোভিয়েত সম্পর্ক জোরদার করার আলোচনা ব্যর্থ হয়। এবং মস্কো চীনে সব ধরনের সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৭ সালে মাওপন্থী হাজার হাজার রেড গার্ড বেইজিং–এর মস্কো দূতাবাস দু'সপ্তাহ ধরে অবরোধ করে রাখে। ১৯৬৯ সালে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় সীমান্ত প্রচন্ড সংঘর্ষে ৭১ জন রুশ সৈন্য ও বহু সংখ্যক চীনা সৈন্য নিহত হয়। ১৯৭৪ সালে এক পক্ষ সম্পর্ক

www.nagorikpathagar.com

স্বাভাবিকীকরণের প্রস্তাব দিলে অপর পক্ষ কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে ১৯৮০'র দশক থেকে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়।

১৯৮৯'র গোড়ার দিকে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডোয়ার্ড শেভার্দনাদজে চীন সফরে যান। ১৯৬৯'র পর কোন উচ্চ পদস্থ রুশ নেতার এ সফর অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ ৩০ বছরের মাঝে টুকিটাকি যত টুকুনই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মাঝে মধ্যে ছিটেফোঁটা হয়ে থাকুক না কেন প্রকারান্তরে ৩০ বছর পর রাতারাতি এ পরিবর্তন তীক্ত সম্পর্কের অপনোদন করেছে। প্রায় ৪০ বছর চীন ও রুশ বন্ধুদের সম্পর্ককে কৌশলে পরিহার করে এসেছিল। তার এখন ইতি ঘটেছে। পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে তখন উভয়ই। বেইজিং এ অবস্থানরত এশীয় কূটনীতিদের একজন মন্তব্য করেছিলেন গত ৪০ বছর যুক্তরাষ্ট্র–সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ব্যবধানটা মারাত্মক ছিল না। বরং ঐ ব্যবধানের সূত্র ধরে ছিল চীন–সোভিয়েতের তিক্ততা মিটিয়ে ফেলারই ইঙ্গিত।

এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ মে, ১৯৮৯তে চীন নেতার সাথে ৪ দিন ধরে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। সারাটি বিশ্ব ঔৎসুক্য দৃষ্টিতে কেউ বা আনন্দের সাথে কেউবা কিছুটা তিক্ততার সাথেই তাকিয়ে দেখে রুশ চীন নেতার বৈঠকের দিকে। দুটো দেশের মধ্যে আদর্শ গত মিল কিছুটা থাকলেও অনেক দিন ধরে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে স্নায়ু ও বাস্তব যুদ্ধ চলছিল। কেউ যেন কারও প্রভাব প্রতিপত্তি ভালো দৃষ্টিতে দেখতে পারছিল না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে ১৯৮৯'র শীর্ষ বৈঠক কতটুকু আন্তরিকতার বা কতটুকু বাস্তবতার নিরিখেই হয়ে গেলো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন মত পোষণ ইশতিহারে লক্ষ্য করা গেলেও আবার অনেকাংশে তা অমীমাংশিতই রয়ে যায়। তবে মার্কসবাদ যে অচল, তা স্বাভাবিকভাবেই চীন ও রুশ নেতৃবৃন্দ মেনে নেন। তারা বলতে শুরু করেন মার্ক্সের তত্ত্বকে ঢেলে সাজিয়ে বা সংশোধন করে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সাথী করে নিতে হবে। অথচ কিছু কাল পূর্বেও দুই কমিউনিষ্ট দেশের তাত্ত্বিকরা এমনটি ভাবতে পারতেন না। তারা এটাকে পার্টি বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে ধরে নিতেন। পরপর গর্বাচেভের শেষ তাত্ত্বিক দিকটি বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলে। এই নতুন ফর্মুলায় রুশ জনগণ গণতন্ত্রায়নের সুযোগ পেল। তার পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ট নীতি এবং চীনা নেতাদের সংস্কার কর্মসূচী মূলত কম্যুনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রকে চপেটাঘাত করছে। প্রথমতঃ রুশ নেতাদের এহেন পরিবর্তনের আভাসে চীনারা তাদেরকে সংশোধনবাদী বলে বিষোদাগার করতো। সমাজতন্ত্রবাদের জন্যই দুটো দেশের অসংখ্য নিরীহ জনতা নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে এবং তা দু'দেশের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থনীতি ক্ষীণ পর্যায়ে এসে পৌছার জন্য তারা সমাজতন্ত্রকেই দায়ী করে। উল্লেখ্য যে, শীর্ষ বৈঠকে উভয় নেতাই উপরোক্ত বিষয়গুলোকে খুব একটা এড়িয়ে যেতে পারেননি।

www.nagorikpathagar.com

সীমান্ত সমস্যা চীন রাশিয়ার একটা ব্যাপক পরিমাণেই ছিল। আর এ ব্যাপারে কিছুটা ঐক্যমতে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্নতাই ছিল। মতৈক্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি কম্পুচিয়াকে নিয়ে চীন বলে যে, কম্পুচিয়ার নির্বাচন পর্যন্ত ভিয়েতনাম সমর্থিত সরকারের স্থলে খেমাররুজসহ ৪টি বিদ্রোহী উপদলের জোটকে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। আবার অন্যদিকে রাশিয়া মনে করে ৩টা অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে আসলেও মূলত কম্পুচিয়ার ব্যাপারটি আভ্যন্তরীণ, সুতরাং কম্পুচিয়া প্রশ্নে মীমাংসিত ব্যাপারটি জনগণই করবে। জনগণের মতোর দোহাই দেয়ার অর্থই হলো নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান সরকার বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা। অবশ্য মস্কো–বেইজিং উভয়ে এই মর্মে একমত হয় যে তারা কম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামী সৈন্য প্রত্যাহারের পর লড়াইরত পক্ষসমূহের প্রতি সামরিক সহায়তা ধাপে ধাপে হ্রাস করবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একেবারে বন্ধ করে দেবে। রুশ–চীন সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা স্বাভাবিক ও সৎপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের সঙ্গে সংহতি রেখে সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস করবে। এ ছাড়া বিতর্কিত ভূখন্ড সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা হবে পররাষ্ট্র পর্যায়ে আলোচনা করে। ইশতেহারের আরেকটি চমকপ্রদ ঘোষণা ছিল পরোক্ষভাবে মার্কিনকে তাদের ব্যাপারে নাক গলাতে না দেয়া। এখানে তৃতীয় কোন দেশকে বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই বুঝান হয়েছে। কিন্তু ধনবাদী দেশ আমেরিকা তো কচি খোকা নয় যে, তার বুঝতে বাকী থাকবে কিন্তু তবু রুশ প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যই শীর্ষ বৈঠককে অভিনন্দন জানায় বুশ প্রশাসন তথা গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বের সাফল্য ঐখানেই যেখানে চীন রাশিয়ার মত প্রভাবশালী ও সমাজতান্ত্রিক গুরুদেশসমূহে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছ। সেজন্যই চীন রাশিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বকে যতই গালমন্দ করুক না কেন তা তাদের জন্য মিঠে পানির ন্যয়ই স্বাদ হবে। আর অন্যদিকে চীন রাশিয়া সমাজতন্ত্র নামক বাদকে নিয়ে গোড়া থেকে চীৎকার করে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে তার পরিবর্তন করে বিশ্বের দরবারে এনেও অন্তর্জালায় ভুগছে। তবুও তাদের যে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে তাতেই বিশ্ববাসী মোবারকবাদ জানিয়েছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে পোলান্ড দেশ, কিছু বর্ণনা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতও পোলান্ড ইউরোপের মধ্যস্থলে একটি দেশ, আজ একটি নতুন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। ৩লাখ ১২ হাজার ৬শ' ৮৩ বর্গকিলোমিটার বৃত্তের পোলান্ডে ১৯৮৮ সালের হিসাবানুযায়ী জান যায় সেখানে তৎকালীন লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৮০ লাখ অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা বাস করছিল ১২১·৫২ জন। কিছুদিন পূর্বের এই কম্যুনিষ্ট শাসিত দেশ পোলান্ড বর্তমান বিশ্বে ৬১তম দেশ হিসেবে পরিগণিত। এর আশপাশ প্রায় দেশ। যেমন রয়েছে পূর্ব জার্মানীর সাথে সযুক্ত ওদরা ও লুসাতিয়ান নায়সব নদী দুটো বরাবর পোলান্ডের ৪শ ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত, সোভিয়েত

www.nagorikpathagar.com

ইউনিয়নের সাথে ১ হাজার ২শ ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক, এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে ১ হাজার ৩শ ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পর্বতময় সীমান্ত।

পোলান্ডের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের গ্রীষ্মকালে রাস্তার দু'পার্শ্বে অসংখ্যা ফলের বাগান, শ্যামল মাঠ ও পাখীর কলকাকলীতে ভরা ঘন সবুজ বন দেখা যায়।

এক হিসেবে জানা যায় পোলান্ডের শতকরা ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা শহরের অধিবাসী হিসেবে বসবাস করছেন। ১৯৮৮'র ৩ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬০ শতাংশের মধ্যে আসে ২ কোটি ২৪ লাখ। আর ৩৭টি শহরের প্রতিটিতে কম করে হলেও ১ লাখ করে জনসংখ্যা আছে। খোদ রাজধানী নগর ইদানিং কালে ব্যাপক পরিচিতি যার সেই ওয়ারশতে ১৬ লাখ ৫৫ হাজার লোক বাস করে। প্রধান প্রধান নগরীর মধ্যে দেখা যায় প্রায় সবার পরিচিতি গদানাস্কসহ, লুবলিন, লোদাজ, পোজনান, সেজেমিন, বাইদগজহু, ক্র্যাকো, রোকলো,কাতোয়াহিম,

আদি কালের পোলান্ডে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। তাই প্রায় হাজার বছর পূর্বে রাজকুমার মিজলে ১ রয়াল পিয়াস্ট ব্যশ প্রতিষ্ঠা করে পোলিশ জাতির বাসভূমি তার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। ব্যাপিটস্ট ধর্ম অবলম্বনের পর থেকে পোলান্ডের সূচনা হয় একটি রাষ্ট্র হিসেবে। ইতিহাসভিত্তিক দেখা যায় প্রায় একাদশ শতকে পোলান্ডের প্রথম রাজা বলেঁসন চরোবাই'র শাসনামলে পোলান্ডে শক্তি সঞ্চয় করে। পঞ্চদশ শতকে জাগিয়ে লগিয়ান রাজবংশের শাসনামলে পোলান্ড ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয় যেমনটি এককালে স্পেনে মুসলিম সভ্যতার প্রসার শক্তিশালী হিসেবে সারা বিশ্বে ঘটেছিল। বেশ পূর্ব থেকেই দেখা যায় পোলিশ জনসাধারণ নরম প্রকৃতির। তারা বিদেশীদের সাথে খোলা মতামত ব্যক্ত করে থাকে। এবং সে প্রেক্ষাপটেই অষ্টদশ শতাব্দীতে পোলান্ডের অধঃপতন নেমে আসে। দুর্বলতার সুযোগেই প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়াও রাশিয়ার আক্রমন এক ভূমিকার কারণে ১২৩ বছর পোলিশ রাষ্ট্র ছিল বিশ্বের বুকে অস্তিত্বহীন। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় এ সমস্ত দেশের দ্বারা পোলান্ড আক্রান্ত হয়েছে ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭১৫ সালে। পোলান্ডের জনগণ বীর বিক্রমে সারা দেশের আযাদী পায় ১৯১৮ সালে। কিন্তু এছিল মাও দু' যুগের সমপরিমান কাছাকাছি সময়।

পোল্যান্ড যখন পর্যদস্ত হয়

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে অন্যান্য দেশের মত পোল্যান্ড নাজী জর্মানী কর্তক আক্রান্ত হয়। ১৯৩৯ সালের দিনগুলোয় বিশ্ব একটা বিষাদময় অবস্থায় ভরে গিয়েছিল। পৃথিবী ব্যাপী মানুষের চোখে ঘুম ছিল না, মানুষ সব সময় একটা আতঙ্কে থাকতো। দু'বছর ব্যাপী এ যুদ্ধে ৫ কোটি মানুষ

www.nagorikpathagar.com

প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ ছিল নিরীহ বেসামরিক। হত্যার সব কৌশলই প্রয়োগ করা হয়। মানবপ্রাণী মারা গিয়েছে গুলি খেয়ে, পানিতে ডুবে, বোমায়, বরফের হিম শীতলতায়, অনাহারে, বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা। কোটি কোটি মানব পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, আহত ও জখম হয়ে এ ধরার বুকে ভবিষ্যত দুরাশা নিয়ে বেঁচে যায়।

এডলফ হিটলার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শুরুই করেন বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা ও হত্যা আর হত্যা দিয়ে। আশপাশ দেশগুলো ছাড়াও পোল্যান্ড আক্রমনের জন্য ১লা সেপ্টেম্বরে ১৯৩৯ সাল নির্ধারণ করা হয়। এক রকম প্রবঞ্চনাই হোক আর বিশ্বাস ঘাতকতাই হোক নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই জার্মান সীমান্তের কাছে গ্লেইডটজ শহরে হত্যাকান্ড আর নারকীয় তান্ডবলীলা শুরু করেন। বার্লিনের বাইরে ওরা পিয়েনবার্গ বন্দী শিবির থেকে তিনটি জার্মান এস, এস, সেনাদল বারজন কয়েদীকে বের করে আনে। তাদেরকে পোলিশ সামরিক বাহিনীর পোশাক পরান হয় এবং শরীরে বিষ ঢুকিয়ে পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ভাবে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার নিমিত্তে পোলিশ সেনা সাজে সজ্জিত বার ব্যক্তির লাশ বিদেশী সাংবাদিকদেরকে দেখানোর জন্য হচলিন্ড গ্রামে একটা বনের কাছে ফেলে রাখা হয়। তারা জার্মান বেতারে মোজার্টের এক সুরধ্বনি সম্প্রচার করে এবং বেতার কেন্দ্রের সবদিকে তাক করে পাল্টা গুলি চালায়। হামলাকারীরা জোরে জোরে পোলিশ ভাষায় চিৎকার করে বলতে থাকে যে পোলিশ বাহিনী জার্মানীর উপর হামলা চালাচ্ছে। তারপর তারা তড়িঘরি করে পালিয়ে যায় এবং চিহ্ন হিসেবে আরও একজন পোলিশ সেনার লাশ ফেলে রেখে যায়। এরপর ২য় দিনে ঠিক এমনি খিস্তি খেউর ছেড়ে পোল্যান্ডে আক্রমনের পথ প্রশস্ত করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। মজার ব্যাপার হলো পোল্যান্ড আক্রমনে যাওয়ার পূর্বেই হিটলার রাশিয়ার নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের সাথে গোপন চুক্তি করেছিল, যাতে করে রুশরা পোল্যান্ডের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিহিংসা মূলকভাবে পোল্যান্ডের এক হাজার সাড়ে সাতশত মাইল সীমান্ত জুড়ে প্রচন্ডতম আঘাত হানে।

কোন রকম সামান্য হুঁশিয়ারি ছাড়াই জার্মান জেনারেল ওয়াল্টার ভন ব্রাউচিটস জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত শহর ডান জিগকে পাশ কাটিয়ে ৪র্থ সেনাবাহিনীকে বিবদমান পোলিশ সীমান্তের মধ্য দিয়ে পাঠায়। অষ্টম ও দশম বাহিনী ওয়ারশ'র অভিমুখে ভিস তুলার সমতল ভূমির দিকে হামলা চালায়। চৌদ্দতম বাহিনী সাইলোশিয়া হয়ে ক্রাকাউর দিকে ধাবিত হয়। ১৫ লাখ দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা হামলার নেশায় মারমার কাটকাট করে সামনে এগিয়ে চলে। এরও সাথে ছিল জার্মান গোলন্দাজ বাহিনীর দ্রুততম ২৭শ' ট্যাঙ্ক।

নাজিরা পোলিশ জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। তারা পোল্যান্ডবাসীর বিরুদ্ধে গণ হত্যা চালায়। পোল্যান্ডের জনগণ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সকল দিকে থেকে যুদ্ধ চালায়। যুদ্ধ শেষে পোল্যান্ডের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৬শ'। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৬০ লক্ষের মত পোলিশবাসীর প্রাণপাত হয়। দখলদার বাহিনীর নির্মূল

www.nagorikpathagar.com

অভিযান নীতির অব্যবহিত পর ৫০ লক্ষাধিক লোক ধ্বংস হয়। ১৯৪৪ সালে ওয়ারশতে যে গণ আন্দোলন হয় তা ছিল নাজি দখলদারের বিরুদ্ধে সর্ববৃহত গণ আন্দোলন। এ আন্দোলনে আনুমানিক ১৮ হাজার বিদ্রোহী প্রাণ হারায়।

সবশেষে সোভিয়েত ও পোলিশ সেনা বাহিনীর সৈন্য আক্রমনাভিযানের প্রেক্ষিতে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ের পোল্যান্ড পুনঃ স্বাধীন হয়। গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহ ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে পোলিশ ন্যাশনাল লিবারেশন কমিটি প্রতিষ্ঠার করে এবং ২২শে জুলাই পিপলস পোল্যান্ড'র ঘোষণা দেয়।

পোল্যান্ড সমাজতন্ত্র

দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যান্ড তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে এগুতে থাকে। কাছাকাছি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে রুশরা এগিয়ে আসার সুবাদে পোল্যান্ড ও কিছুটা তাদের অনুধাবন করার চেষ্টা করে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও যেমন দেখা যায় দুর্যোগময় মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী দেশ সহায়তা করলে কৃতজ্ঞতা বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত করে তেমনটির পোলান্ডে ও ঘটেনি। তাই ১৯৪৭ সালে পোলান্ডে যে নির্বাচন হয় সোভিয়েট লাল বিপ্লবের আছর তাদের মধ্যে পড়ে। তাই তো দেখা যায় ১৯৪৭'র নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীরা পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসে। তারা পুরোপুরি ক্ষমতার মসনদে আরোহন করে। সমাজতন্ত্রীদের বিজয় তাদের আরো প্রভাবিত করলো যে দেশে তারা অর্থনৈতিক যুক্তিসহ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

পূর্বইউরোপীয় এ সমাজতান্ত্রিক দেশটি অর্থনৈতিক ভাবে কখনোই স্বাবলম্বী ছিলো না। সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী তেলের মূল্য বেড়ে গেলো পোল্যান্ডের অর্থনীতিতে তার মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন মুদ্রাস্ফীতি গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২শ'ভাগ। পোল্যান্ডের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমান ৩ হাজারের ৯শত কোটি ডলার। প্রতি বছরেই যার সুদই গুনতে হয় ৩শত কোটি ডলার। অন্যান্য পর্ব ১৬ রূপী দেশের মতো পোল্যান্ডের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। এ সমস্ত প্রেক্ষাপট ও অর্থ নৈতিক সংকটইসহ পোল্যান্ড বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়লে ১৯৮২ সালে লেস ওয়ালেসার নেতৃত্বে সলিডারিটির দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। গদাঙ্কে শ্রমিকদের মধ্যে শূরু হলে তা মূলত অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে খনি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা পরিবহন শ্রমিকরাও তাকে যোগ দেয়। পোল্যান্ডে ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে আধুনিক সরঞ্জামের অভাবে মানুডার আমলের গরু দিয়েই চাষাবাদ করা হয়। এতে পোল্যান্ডে মাংসের এ ঘাটতি দেখা দেয়। এভাবে পোল্যান্ডে কম্যুনিষ্ট আমলাতন্ত্র চালূ হওয়ায় আর ও অর্থনৈতিক সংকট গুরুতর আকার ধ।রণ করে।

www.nagorikpathagar.com

পোল্যান্ড থেকে ফিরেই হারভার্ডের অর্থনীতিবিদ জেকি সাকস যে রিপোর্ট পেশ করেন তা অত্যন্ত হতাশা ব্যাঞ্জক। অতি মদ্রাস্ফীতির হার মাসিক শতকরা ১শ'ভাগ পৌঁছে। সরকার রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি মেটাতে প্রচুর মুদ্রা ছাপে। আর কৃষকরা গবাদি বাড়িয়ে দেয়। দু'পাউন্ডের এক টুকরা শুকরের মাংস কিনতে একজন অবসর প্রাপ্ত লোকের পেনসনের টাকা একবারেই শেষ হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে পোল্যান্ডের সংকট এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে উদীয়মান পরিস্থিতির মধ্যে অসমান্তরাল অবস্থান। প্রায় একদশক ধরে পোল্যান্ডের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের নিজস্ব কাজের জন্য আরো জিজ্ঞাসাবাদ যোগ্য করার অভিপ্রায়ে চেষ্টা চালান। মধ্যম মূল্য নমনীয়তার অনুমতি দেয়া হয়। এ সংস্থার সত্যিকার অর্থে খুব সামান্য ফল পেয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় পার্টি ও বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রণ পরিহার করা হয়নি। এর ফলে হয়েছে অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং রাজনৈতিক স্থবিরতার চক্র।

শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করতে কম্যুনিষ্ট প্রশাসন মজুরী বৃদ্ধি করেছেন। অধিক উৎপাদন ছাড়াই অধিক বেতন সৃষ্টি করেছে উভয় সংকট। সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্য বজায় রাখার ফলে সংকটের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কেননা জটিল সমৃদ্ধ ভোক্তরা যা কিছু পায় তাই কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। পোল্যান্ডে এই চক্র অত্যাধিক মুদ্রাস্ফীতি ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার জন্ম দিয়েছে। সত্যিকারার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নেও এই একই চক্র বিরাজ করছে। পেরেস্ত্রয়কার সংস্কার সুফল দিয়েছেন খুব সামান্য। মজুরী,অভাব ও মূদ্রাস্ফীতি সব কিছুই বাড়ছে। সোভিয়েত নেতাদেরদেক যে জট বিশেষভাবে বিরক্ত করছে তা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট অর্থনীতি এবং বাজার পদ্ধতির মধ্যে কোন প্রকৃত আবাসস্থল নেই। বাজারের জন্য প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক মুনাফা তাড়িত ক্রেতা ও বিক্রেতা। বহু কোম্পানী রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও তারা তুলনামুলকভাবে স্বাধীন এবং তাদের নিজস্ব ব্যয় ও মূল্যের অবশ্যই দায়িত্বশীল হবে। ৩ বাধা দূর করা গেলেও পোল্যান্ডে সম্ভাবনা আছে।) বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি সৃষ্টির পথে বাস্তব বাধা বাধা এখনো অনেককে বিচলিত করছে।

কম্যুনিস্ট শাসনের অপমৃত্যু ও ডানপন্থীদলের আগমন.

এ বছর গোড়ার দিককার ঘটনা। কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কারণ যেখানে বিশ্বের ব্যাপী মার্কসবাদ মার খেতে শুরু করেছে সেখানে পোল্যান্ড অনাহুত কেন সময়ক্ষেপন করবে। প্রগতিশীল বিশ্বের সালে তাদেরও আগাতে হবে। দীর্ঘ সাত বছর ধরে লৌহ কঠিন শাসন চালানোর পর কম্যুনিষ্ট বিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত স্বাধীন ট্রেড

www.nagorikpathagar.com

ইউনিয়নে সংগঠন সলিডারিটির সাথে আপষে আসতে চায়। তাইতো সলিডারিটি নেতা লেস লেসওয়ালেসা জেনারেল জেরু জালেস্কীর ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন।

কম্যুনিস্ট স্বৈরতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ পরিবর্তনকে ঠিক সুখকর মুহূর্তও বলা চলে না। তবে হ্যাঁ, সুদীর্ঘ ৭ বছরের তিক্ততা আর পারস্পরিক সন্দেহের বৈসাদৃশ্য পরিবেশের পর সর্বশেষ পরিস্থিতিকে সতর্ক আশীবাদপুষ্ট বলে মনে করা যায়। এক সময় রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের শুলে চড়ানোর কাজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল জেসল কাইজাক বেশ সচেষ্ট ছিলেন। অথচ তিনিই তাদেরকে স্বাগতম জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক ও সুখী মানব সমাজ সম্বলিত নতুন সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য। সমাজতন্ত্র গড়বার লক্ষ্যে তারাইতো যথেষ্ট ছিলেন কিন্তু কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো তা সবারই জানা। এসবের পরেও দেখা যায় কম্যুনিস্ট সরকার প্রধানরা জাতির এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় গিয়ে সলিডারিটির কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় তাই সরকার এক পর্যায়ে সলিডারিটিকে আইনগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করে বসেন। ইতিপূর্বে ১৯৮১ সালে কম্যুনিস্ট সরকার সামরিক আইন জারী করে সলিডারিটিকে বেআইনী ঘোষণা করে। অবশ্য সলিডরিটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পোল্যান্ডের মুরুব্বি দেশ রাশিয়ারও চাপ দিল। এমনি এক সময়ে জেনারেল জেরুজালেস্কীর প্রস্তাব সংগ্রামরত সলিডারিটি নেতা লেসা ওয়ালেসা দৃঢ় প্রত্যয়ের সালে গ্রহণ করে বললেন, "সব প্রস্তাব আমার দল গ্রহণ করেছে।" লেসওয়ালেসা ভাল করেই জানতেন যে, এ টুকুই যথেষ্ট। কারণ পূর্ববর্তী ইতিহাস তার জানা আছে, সে প্রেক্ষাপটেই জনগণকে অতি সহজেই উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন এটাই ছিল তার আত্মবিশ্বাস। আর কম্যুনিস্ট স্বৈরশাসন, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদিতে সমাজ যেখানে নিপতিত সেখানে জনগণকে ডাক দিবার মোক্ষম সময় তখনই।

যে সব বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো ১৯৮৯'র নির্বাচনের কয়েক মাস আগ পর্যন্ত কল্পনাই করা যেতো না। ১৯৮৯'র পোল্যান্ডের নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মূহূর্তে এরকম একটা ঐক্যমত ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার ঐ সময়ই এটা ধারণা করা হয়ে থাকে যে, উক্ত সকল আলোচনায় নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উন্মেষ ঘটাবে। তখনকার ঘোষণায় আব্রো বলা হয়, নতুন নতুন রাজনৈতিক দলগঠিত হবে। নতুন পার্লামেন্টে বিরোধী দলকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন প্রদান করা হবে। প্রেস সেন্সরশিপ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক শিল্প কারখানাসহ সব কিছুর উপরই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শ্লথ হবে। এর বদলে সলিডারিটিকে জাতীয় আপোষ, বিশেষ করে নির্বাচনের সময়ে কোন ধর্মঘট হবে না। এমনি এক চুক্তিতে আসতে হবে। তার প্রতি কোনো চ্যালেঞ্জ হবে না। তাছাড়া সরকারের কষ্টকর ও গণধিক্কৃত অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি জনসমর্থন আদায়ে বেশ সাহায্য হবে। কিন্তু সলিডারিটির পুনরুজ্জীবনে সরকারের এ সদিচ্ছার ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি মহলে ভাঙ্গনের আশংকা দেখা দেয়। দলীয় নেতা জেনারেল জেরুজালেস্কীর নেতৃত্বে পোল্যান্ডের সংস্কারকরা পদত্যাগের হুমকী দিয়ে তাঁদের ম্যান্ডেট পাস করিয়ে নিলেন। এর ফলে ঠিক ঐ সময়ই এই জোর করে সমর্থন আদায়

www.nagorikpathagar.com

করে নেয়ার ব্যাপারটায় পরিস্থিতি ঘোলাটে আকার ধারণ করে। পোল্যান্ডের সরকারী ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদেরকে উপেক্ষা করায় অসন্তুষ্ট। ইতিমধ্যে নোমেল ক্লাতুর নামীয় সুবিধা ভোগ লক্ষ লক্ষ সদস্য আশংকা করছেন, সরকার এই যে অর্থনৈতিক স্বেচ্ছা ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিচ্ছেন তাতে তাঁরা তাদের চাকুরী হারাতে পারেন। রক্ষণশীল কট্টর পন্থীরা ও অসন্তুষ্ট। তারা মনে হয় জঙ্গী মনোভাবসম্পন্ন। নিরাপত্তা পুলিশের উপর এর কোনো প্রভাব না পড়লেও ১৯৮৪ সালে তারা সরকারের নির্দেশনায় সলিডারিটির একজন নেতাকে হত্যা করে। ১৯৮৯ সালের বছরের গোড়ার দিকে দুজন ধর্মযাজককে তাদের ঘরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, অনেকেই মনে করেছিল ঐ সময় তাদেরকে ধরে অনুরূপ ভাবে হত্যা করা হয়। সলিডারিটি মুখপাত্র জামুজ ওনিজ কিয়েক ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, ডান পন্থী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে সলিডারিটির চিন্তা ধারার উপদেষ্টা ক্যাথলিক ধর্মযাজক বলেন, সলিডারিটি ইউনিয়ন পার্লামেন্টে ক্ষমতা ভাগা ভাগির সরকারী ফর্মূলা গ্রহণ করবে; এতে সলিডারিটির জন্য শতকরা ৪০ ভাগ, কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্য শতকরা ৫০ ভাগ এবং রাজনৈতিক ভাবে স্বতন্ত্র সদস্যদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন নির্ধারিত থাকবে। কিন্তু সরকার নির্বাচনের আগেই এসব আসন ভাগ করে নিতে চান। কিন্তু তাতে সলিডারিটির অবস্থা কি দাঁড়াবে তা পরিষ্কার নয়। ও নিজকিয়েব বলেন, "আমরা সম্ভবতঃ এক উত্তরণ কালের দরকার আছে যেখানে নির্বাচন হবে শুধু আংশিক ভাবে অবাধ।"

কিন্তু এতদ্ব সত্বেও বাস্তব প্রেক্ষাপটে পোল্যান্ডের জনগণ কি ভাবছে বা আদৌ তেমন চিন্তা করছে কিনা তা দেখার বিষয়। কারণ রাস্তার মানুষ এ ব্যাপারে যেন কোনো খেয়ালই রাখছে না যেন তারা ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা মানুষকে এমন উদাসীন করে তুলেছে যে, তারা হাঁড়িতে দেয়ার জন্য আলু ক্রয় করতে পারছে না; নিজের বাচ্চা-কাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। সুতরাং রাজনীতি ও তাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়। পোল্যান্ডবাসীরা তখন ভাবছে যে, দেশের ভবিষ্যতের জন্য দুই শক্তিশালী পক্ষ যদি আঁতাতে পৌছতে চায় তাহলে এক পক্ষের উচিত অন্যপক্ষকে নারাজ না করা। তাই বলে এটা তাদের বলিষ্ঠ যুক্তি এমন নয় যে তা কমিউনিস্ট পার্টির স্বপক্ষে যাবে। কারণ জনগণ দীর্ঘদিন থেকে কম্যুনিস্ট শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে চরম হতাশায় জর্জরিত। জনগণ হতাশা বোধ করলেও তাদের সমর্থনের পাল্লা সলিডারিটির দিকেই যাবে, তখন এমনই আন্দাজ করা গিয়েছিল। পোল্যান্ডের ঐতিহাসিক দিকের কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনা পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। তাই তো দেখা যায় জনগণের 'সোনার পাথর বাটিবানিয়ে দেবার গালভরা বুলি আউড়ে ১৯৪৭ সালের নির্বাচন যখন সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন, তখন কি পোল্যান্ডের কেউ জানতেন সুদীর্ঘ ৪০ বছর পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ প্রমাণিত হবে এবং দেশকে আবার পিছন দিকে ফিরে তাকাতে হবে। কিন্তু পোল্যান্ডবাসীর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, স্ট্যালিন বাসীদের দীর্ঘ ১২ বছরের লৌহ কঠিন শাসনে যে

www.nagorikpathagar.com

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল,পরবর্তী কালে সেই ব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্যে আবার আন্দোলনে নামতে হয়েছিল এবং ক্ষমতাসীনদের কিছু কিছু ব্যবস্থা পূর্ণবিবেচনা করতে হয়েছিল। এ এক সত্যেরই বাস্তবতা বটে এবং এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে শ্রমিক রাজ কায়েম করার জন্য পোল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল, কালচক্রে সেই শ্রমিক শ্রেণীই সবচে বেশি নির্যাতিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্য থেকেই সমাজতান্ত্রিক শৃংখলভেঙ্গে ফেলার বজ্র নিনাদ উঠেছিল।

এতকিছুর পরেও পোল্যান্ড থেমে থাকেনি। সরকারী ভাবেই সোভিয়েট আগ্রাসনের নিন্দা জানতে থাকে। তাইতো দেখা যায় পোল্যান্ডে পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ সিনেট ১৯৬৮ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের চেকোশ্লোভাকিয়া অভিযানের নিন্দা করেছে। সাথে সাথে হাঙ্গেরী কম্যুনিষ্ট পার্টির সিনিয়র নেতা নিন্দাবাদ' জানাতে ভুল করেনি। পোল্যান্ডের সিনেটে বলা হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন ঐ অভিযানের মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রননাধিকারের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করে। হাঙ্গেরী কমিউনিষ্ট নেতা আরো বলেন , ভবিষ্যতে যাতে ওয়ারশ জোটভূক্ত কোন দেশে আর সামরিক হস্তক্ষেপ না হয় তার জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহনের আহবান জানান । ঠিক ঐ সময়ে পোল্যান্ডের পার্লামেন্টের সিনেটর ৯৮জন সদস্য সলিডারিটি সমর্থক বলে জানা যায়। তাই সর্ব প্রথম পোল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সর্বম্মত প্রস্তাব পাস করে। একটা কথা উল্লেখ না করেই নয়, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভিকিয়ার রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের নেতা আলেকজান্ডার ডুবকে কে রুশ অভিযানের মাধ্যমে দমন করা হয়। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঐ অভিয়ানে অংশ নেয় বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড। তবে রুশদের আরেক মিত্র দেশ রুমানিয়া ঐ অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই পোলিশ সিনেট পোল্যান্ডের ঐ ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন। পোল্যান্ডের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঐ রুশ অভিযানে পোল্যান্ড অংশ নেয়। পোল্যান্ডের ঘটনাবলীতে দেখা যায়, সেখানে কোন পন্থী বিরোধী দল রক্ষণশীলদের পতাকা তুলতে শুরু করে বেশ পূর্ব থেকেই। গোপনে সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে এবং বিশেষ করে আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই এর বহিঃ প্রকাশ ঘটে। এর নেতারা পোলিশ সমাজের প্রতিনিধিত্বে সলিডারিটির দাবীর সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। এখানে যারা রক্ষণশীল বলে দাবী করেন তারা মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে একটি গ্রুপ পশ্চিমা প্রতিপক্ষ বলে পরিচিত। এই গ্রুপটি রিগানিজম ও থ্যাচারইজমে বিশ্বাসী। ওয়ারশ ও ক্রাকো শিল্প এলাকায় এদের ঘাটি গড়ে উঠেছে। তারা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, হংকং ও সিঙ্গাপুর ধরনের অবাধ বানিজ্য এলাকা ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে জনসভা অনুষ্ঠান করে জন সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলের গ্রুপটি ক্যাথোলিজম ও সনাতন ধরনের জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতি। এ গ্রুপটির কর্মসূচী কম্যুনিষ্ট পোলিশ রাজনৈতিক দলগুলোর মতো। এ গ্রুপের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে রয়েছেন কনফেডারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট পোল্যান্ডের (কে পি এন) নেতা মিঃ লেসজেক

www.nagorikpathagar.com

মকজুলস্কী। ইনি বিশ দশকে রুশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৯ সালের পর থেকে কে, পি, এন'র পুনরায় আত্ম প্রকাশ ঘটে। মিঃ মকজুলস্কী দু'বছর কারাগারে কাটান।

রক্ষণশীল সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার স্থালে উদার ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মত পোল্যান্ডও এগিয়ে আসে, একথা স্বতঃসিদ্ধ। সে জন্যই দেখা যায় ১৯৮৭ সালে সে দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয়। গত বছরের শেষের (১৯৮৮) দিকে পোল্যান্ডের পার্লামেন্ট ঐ সংস্কার কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করার জন্য বেসরকারী উদ্যোগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক তৎপরতাকে উৎসাহ প্রদান করে দু'টি অর্থনৈতিক সংস্কার আইন অনুমোদন করে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন ছাড়া যে গণ অসন্তুষ্ট প্রশাখিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এ সত্য পোল্যান্ড সরকারের বুঝতে বাকী থাকেনি। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ঘোষণার এটাই ছিল প্রকৃত প্রেক্ষাপট। তাছাড়া মুরুব্বীদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আরো কট্টর রক্ষণশীলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনি। সেখানেও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং তার আহুর স্বরূপ পোল্যান্ডই বা পিছিয়ে থাকবে কেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নে রাশিয়া থেকে যে বাধা আসার কথা ছিল তাও দূরীভূত হয়েছে। তাই তাদের বসে থাকার আর সময় নেই। এখানে একটা কথা প্রনিধানযোগ্য যে, পোল্যান্ডই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ যার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে সব থেকে ভালো। সুতরাং এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এতে করে পোল্যান্ড দ্রুত বানিজ্যিক দিক দিয়ে লাভবান হবে। "পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন" এ ধারণাটি বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রথম দেশ পোল্যান্ড নির্বাচনের ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকে। পোল্যান্ড পার্লামেন্ট স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সলিডারিটির উপর থেকে ৭ বছরব্যাপী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন পাস করে। এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে প্রাচ্য শিবিরের পোল্যান্ডেই সর্বপ্রথম অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পরিষদ গঠিত হবে বলে ধারণা করা হয়। পার্লামেন্টে পাস করা আইনমালার আওতায় বেশ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে ৬ দফা আইন প্রস্তাব অনুমোদন করে। নতুন আইনানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পার্লামেন্টে একটি উচ্চ পরিষদ বা সিনেট গঠন করা হবে এবং নিম্ন পরিষদে অন্ততঃ ৩৫ ভাগ আসন বিরোধী দলীয়দের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

'পোলিশ গণপ্রজাতন্ত্রী' নাম পরিবর্তন করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্বকালীন নাম 'পোল্যান্ড প্রজাতন্ত্র' রাখার ব্যাপারে জোড়ালোভাবে প্রস্তাব উথাপন করেন একজন স্বতন্ত্র ডেপুটি রিজার্ভ বেডার। তিনি স্ট্যালিনের সহচর ধিক্কৃত নেতা বোলস্ল বেইরুতের আমলের ঐ রাষ্ট্রীয়

www.nagorikpathagar.com

নামকরণের নিন্দা করেন। পরে তিনি পার্লামেন্টে নেতাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাহারে সম্মত হন।

জুলাই, ১৯৮৯তে ১৯৪০ দশকের পর প্রথমবারের মত একটি স্বাধীন বিরোধী দল পোল্যান্ডের আইন পরিষদের অধিবেশনে প্রবেশ করে। ৪৬০ সদস্য বিশিষ্ট সেজমে (আইন পরিষদ) ১৬১ জন সলিডারিটি নেতা লেস ওয়ালেসা ও পোলিশ নেতা জেনারেল জেরুজালেস্কী আইন পরিষদের অধিবেশনের সামনের সারির আসনে উপবিষ্ট হয়ে আইন পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। এ অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনেও প্রচারিত হয়।

আইন পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিগনিউ রুডনিকী (৬০), যিনি সেজমের একজন প্রবীন সদস্য। তিনি বলেন, আমরা সেজমের অধিবেশনের কাজ শুরু করছি, ইতিহাসে এটা একটা মহান অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এই পরিষদ আমাদের সমাজের আশা-আকাংখা পূর্ণ করতে পারে। তিনি প্রসঙ্গত বলেন, "দেশের তিন কোটি ৮০ লাখ লোকের দৃষ্টি এখন আমাদের এই পরিবর্তনের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। শিকাগো থেকে কাজাকিস্তান পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে অবস্থানকারী পোলিশ নাগরিকদের হৃদয় অধিকতর পুলকিত রয়েছে।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪৬০ জন সদস্যের সকলেই শপথবাক্য পাঠ করেন। সলিডারিটি ঘোষণা করে যে, আইনের অধ্যাপক আদ্রেজ স্টেল ম্যাকোস্কী সিনেটের মার্শাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পক্ষান্তরে কৃষক পার্টির জনৈক সদস্য সোসালিষ্ট মিকোলাজ কোজাকীউজ নিম্ন পরিষদের নেতার দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় পোল্যান্ডের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ব্যাপকভাবেই ভরাডুবি ঘটে। সলিডারিটি ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাপক ভোটে জয়ী হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ কম্যুনিষ্ট সরকার পোল্যান্ডকে অর্থনৈতিক দুর্দশার কবল থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ। শুধু তাই নয় পোলিশ জনগণের জীবনযাত্রার মান পড়ে যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পোলিশ জনগণের মনে গণঅসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। নির্বাচনের ফলাফলের পূর্বে এগুলো ছিল সত্যিকারার্থেই সবাক চিত্র। পোলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল জেসল কিসজা বিজয়ী সলিডারিটি নেতা লেস ওয়ালেসাকে অভিনন্দন জানান, অথচ বছর আটেক পূর্বে এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীই ওয়ালেসাকে গ্রেফতারের নির্দেশ হাঁকিয়েছিলেন।

পোল্যান্ডের নির্বাচন বিধির অধীনে সলিডারিটি ট্রেড ইউনিয়নকে পোলিশ সংসদের মোট আসনের এক তৃতীয়াংশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হয়। এই এক তৃতীয়াংশ আসনে সলিডারিটি বিজয় লাভ করে। শেষাবধি প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কী সলিডারিটির বিজয়কে দ্বিধাহীন চিত্তেই মেনে নিতে বাধ্য হন। তাই তো ভোটের পর তাঁর শীর্ষস্থানীয় সহকারী বলেন, "আমাদের সর্বোচ্চ পরাজয় ঘটেছে। এখন রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নির্বাচনে জনগণ সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দিয়েছে, তবে জেরুজালেস্কী বিজয়ীদের প্রতি সতর্ক করে দিয়ে উল্লেখ

www.nagorikpathagar.com

করেন যে, পোলিশ জনগণের গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি আরো বলেন, ৭০ বছর পূর্বেও দেশে গণতন্ত্র চালু ছিল, কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে।

নিম্নে এক নজরে জানুয়ারী ১৯৮৯ থেকে আগষ্ট ১৯৮৯ পর্যন্ত সময়ে পোলান্ডের রাজনৈতিক ঘটনায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বকে কম্পিত করে তুলেঃ

(১) ১৭ই জানুয়ারী আলোচনার জন্য সলিডারিটি পূর্বশর্ত মেনে নিয়ে কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্তের অধীনে সলিডারিটি ট্রেড ইউনিয়নকে বৈধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

(২) ৬ই ফেব্রুয়ারী ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতার বিনিময়ে কম্যুনিষ্ট-নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্নে সরকারের সাথে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়।

(৩) ৫ই এপ্রিল আইন পরিষদ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও আংশিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনসহ পোল্যান্ডের ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন "সামাজিক চুক্তি" অনুমোদনের মাধ্যমে সলিডারিটি নেতা লেসওয়ালেসা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চেসলে কিসজাক ঐতিহাসিক আলোচনা সমাপ্ত করেন।

(৪) ১৭ই এপ্রিল সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে সলিডারিটিকে পুনরায় একটি স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়।

(৫) ৮ই মে-পূর্ব-ইউরোপের প্রথম স্বাধীন দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে সলিডারিটির নির্বাচনী সংবাদপত্রে প্রচার শুরু হয়।

(৬) ৪ঠা জুন আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে সলিডারিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত হয়।

(৭) ১৯শে জুলাই জাতীয় সংসদ জেনারেল জেরুজালেস্কীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। জেনারেল জেরুজালেস্কী পরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মিঃ কিসজাক তার স্থলাভিষিক্ত হন।

(৮) ৭ই আগস্ট মিঃ ওয়ালেসা সলিডারিটি এবং ক্ষুদ্রতর গণতান্ত্রিক ও কৃষক পার্টির সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশনের নেতৃত্বে একটি অকম্যুনিষ্ট সরকারের প্রস্তাব দেন। ক্ষুদ্র এ দল দু'টি ঐতিহ্যগতভাবে কম্যুনিষ্টদের সহযোগী ছিল।

(৯) ১৪ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী কিসজাক সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়ে তার প্রচেষ্টা বাতিল করে দেন এব ঘোষণা করেন যে, তিনি পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

www.nagorikpathagar.com

(১০) ১৬ই আগস্ট কৃষক ও গণতান্ত্রিক পার্টি মিঃ ওয়ালেসার পরিকল্পনা অনুমোদন করে এবং সলিডারিটির আইন প্রণেতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সোভিয়েত জোটের প্রথম অকম্যুনিস্ট সরকার গঠনের আহ্বান সম্বলিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

(১১) ১৭ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কী একটি অকম্যুনিস্ট কোয়ালিশন সরকার গঠন সংক্রান্ত মিঃ ওয়ালেসার ধারণা অনুমোদন করেন এবং কিসজাক আনুষ্ঠানিকভাবে তার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

(১২) ১৯ই আগস্ট প্রবীণ সাংবাদিক ও মিঃ ওয়ালেসার উপদেষ্টা মিঃ তাদেউস মাজোওয়েস্কি প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কীর সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি জানান, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট তাকে প্রস্তাব দিতে পারেন এবং এ ধারণা বাস্তবে রূপ নিলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। একজন শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা অবশ্য জানান যে, প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কী প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য মিঃ মাজোয়েস্কিকেই আমন্ত্রণ জানাবেন (ইউএনবি/এপি)।

কম্যুনিস্টের খতম করেই অকম্যুনিস্ট শাসন শুরু

বিশ্ববাসী তাকিয়ে আছে কম্যুনিস্ট পোল্যান্ডে কি পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। নির্বাচনের পূর্ববর্তী বেশ কয়েক মাসের যে ঘটনাবলী তা সমস্ত বিশ্বকেই থমকে দেয়। সহসাই পোলিশ সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কী সলিডারিটির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ও 'সলিডারিটির উইকলি' পত্রিকার সম্পাদক তাদেউস মাজোওয়েস্কিকে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে যাচ্ছেন বলে এক প্রকার নিশ্চিত আভাস পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে নির্বাচনে ভরাডুবির ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ কিসজাক পদত্যাগ করেন। এমনিতর বিব্রতকর অবস্থায় পোল্যান্ডে সলিডারিটি কম্যুনিস্ট পার্টি বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। এক পর্যায়ে পোল্যান্ড প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত তাদেউস মাজোওয়েস্কীকে পার্লামেন্টে অনুমোদন দেয়ার পূর্বে একটি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির দাবী সলিডারিটি নেতারা প্রত্যাখ্যান করায় সলিডারিটি ও কম্যুনিস্ট পার্টি এক চরম শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, মাজোওয়েস্কী ও সলিডারিটি নেতা লেসওয়ালেসা চ্যালেঞ্জ দিয়েই বলেন, তারা এ ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। মোট কথা পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদে তাদেউস মাজোওয়েস্কীর মনোনয়ন পার্লামেন্টে অনুমোদিত হওয়ার আগে সরকারী নীতি সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টি ও সলিডারিটিকে মতৈক্য পৌছাতে হবে বলে পার্টি যে দাবী করে তা মাজোওয়েস্কী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে শীঘ্রই আলোচনার পরিকল্পনা করবেন। তবে আগে আমাদের মনোনয়ন পার্লামেন্টে অনুমোদিত হতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

এদিকে সলিডারিটি নেতা লেসওয়ালেসা কম্যুনিস্ট পার্টিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন সরকার গঠনে সলিডারিটির সঙ্গে সহযোগিতা না করলে পোল্যান্ডের কম্যুনিস্ট পার্টির কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ থাকবে না। কম্যুনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কীর সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারের একটি বড় ভূমিকা দাবী করার পরেই ওয়ালেসা গদানস্কে সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্যকরেন।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জেরুজালেস্কী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মিঃ মাজোওয়াস্কিকেই মনোনীত করেন। মিঃ জেরুজালেস্কী ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তাকে পছন্দ করেন বলে একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা জানান। সলিডারিটি সূত্রে আভাস দিয়ে বলা হয়, ৬২ বছর বয়স্ক প্রবীণ সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতা লেসওয়ালেসার উপদেষ্টা রোমান ক্যাথলিক মিঃ মাজোয়েস্কিকেই সম্ভবতঃ ব্যাপক ভিত্তিক একটি কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হবে। নতুন এই কোয়ালিশনে অপর যে দুটি দল থাকবে তাহলো কৃষক দল ও গণতান্ত্রিক দল। মিঃ মাজোওয়েস্কি শেষ পর্যন্ত পোল্যান্ডের নয়া প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তবে তিনিই প্রথমবারের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে একটি অকম্যুনিস্ট সরকার গঠন করেন।

এমনি বৈতরণী পার হবার প্রাক্কালেই বিগত ৪০ বছরের মধ্যে পোল্যান্ডের প্রথম অকম্যুনিস্ট প্রধানমন্ত্রী তাদেউস মাজোওয়েস্কী এক কোয়ালিশন সরকার গঠনের কাজ শুরু করেন। নতুন পোলিশ প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও মার্কিন সিনেটের রবার্ট ডোলের সাথে বৈঠকের মধ্যদিয়ে তার প্রথম ও পূর্ণ কর্মদিবস শুরু করেন। তিনি বলেন, আমি সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সলিডারিটি কর্মী তাদেউস মাজোওয়েস্কি পোল্যান্ডের নয়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পোল্যান্ডের ওয়ারশ সামরিক জোটভুক্ত রাখার ও সোভিয়েত ব্লকভুক্ত মিত্রদের সাথে সহযোগিতার শপথও ব্যক্ত করেন।

পোলিশ প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত মন্তব্যে দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, মিত্রদেশগুলোয় পোল্যান্ডের সাম্প্রতিক যে প্রবাহ তার আগুন জ্বালিয়ে দেয়া, দ্বিতীয়তঃ পাশাপাশি বৃহৎ স্বৈরাচারী রুশ সরকারকে ন্যূনতম খুশী রাখা। কিন্তু এরপরে গিয়ে দেখা যায় লেসওয়ালেসার জ্বালাময়ী কথাবার্তা। সলিডারিটি নেতা ওয়ালেসা বলেন, তিনি সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভের সংস্কার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন, তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, পোল্যান্ডে স্ট্যালিন, ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভের মতবাদের স্থান নেই। তিনি দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পোল্যান্ডের নয়া সরকারের প্রতি অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসায় ব্যর্থতার জন্য পাশ্চত্যের সমালোচনা করেন। তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, গণতন্ত্রের উষালগ্নের নয়া সরকার যদি ব্যর্থ হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র বিশ্বই দায়ী থাকবে।

www.nagorikpathagar.com

লেস ওয়ালেসা নয়া সুর উচ্চারণ করে বলেন, তিনি তার দেশে কম্যুনিজমের মৃত্যু কামনা করেন তবে তাই বলে মার্কিনী ধরনের পুঁজিবাদও চান না। অল্প কিছুদিন আগ পর্যন্ত তার দেশে যে ধরনের কম্যুনিজম চালু ছিল, তিনি তার মৃত্যু দেখতে চান সলিডারিটি নেতা বলেন ,গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে তারা একটি নয়া পদ্ধতি গড়ে তুলতে চান। তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হবে না। পুঁজিবাদ অপেক্ষা উন্নত মানের শাসন ব্যবস্থা হবে। তিনি বলেন, তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট অথবা অন্যকোন রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হতে আগ্রহী নহেন।

পোল্যান্ডের মুখ খুলেছে

নির্বাচনী ঝক্কি ঝামেলা শেষে কম্যুনিজম বিদায় নেবার পর পোল্যান্ডের হুঁশ ফিরে আসে। পোল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ পোলকে বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরে প্রেরণ এবং সাইবেরিয়া ও কাজাখস্থানে নির্বাচন দেয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আহবান জানায়, পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্কুবিসেওস্কী পার্লামেন্টে আরও ঘোষণা করেন যে, অকম্যুনিস্ট প্রধান মন্ত্রী মাজোভিস্কি সরকার পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী উভয় দেশের নিকট যুদ্ধবাবদ ক্ষতিপূরণ বিষয়টি উত্থাপন করবে। বিশ্বযুদ্ধকালে নাৎসী জার্মানীতে প্রায় ২০ লক্ষ পোলের বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরে প্রেরণ এই ক্ষতিপূরণের আওতায় পড়বে। মিঃ স্কুবিসেওস্কী সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাকোওস্কীর কড়া সমালোচনা করে বলে, তার ও তার পূর্বের সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা ক্রেমলিনের উর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে সোভিয়েত ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে ব্যর্থ আলোচনা করেন। পোলিশ জনগণ কী এ প্রশ্নে সন্তুষ্ট হবে। ভবিষ্যতেই এর জবাব নিহীত। তবে মন্ত্রী বলেন, 'ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি কখনই আমরা ছাড়ি নাই।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৩৯ এবং ১৯৫৯ সালের মধ্যে ৩৫ লক্ষ পোলকে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সাইবেরীয়া অথবা কাজাখস্থানে নির্বাসনে পাঠায়। তাদের মধ্যে অনেকের শ্রান্তি ও অবসন্নতায় মৃত্যু ঘটে। বন্দী শিবিরেও বহু লোককে হত্যা করা হয়। ১৯৩৯ ও ১৯৪১ সালের মধ্যে স্ট্যালিন প্রায় ২০ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠালে তারা পোল্যান্ডের পশ্চিমাংশে বাস করতে থাকে। ১৯৩৯'র মলোটভ--রিবেনট্রপ চুক্তির অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ডের ঐ এলাকা গ্রাস করে। এই গণ নির্বাচন বাল্টিক রাজ্য লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও এস্কোনিয়ায় পরিচালিত অভিযানের অনুরূপ। পশ্চিম জার্মানী পোল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গের ইতি ঘটেছে বলে মনে করে। ১৯৫৩ সালে সরকারী ভাবে স্বীকৃতির বিনিময়ে বনের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব পোল্যান্ড প্রত্যাখ্যান করেছিল। ইতিমধ্যে পূর্ব জার্মান কর্তৃপক্ষ অব্যাহতভাবে ক্ষতিপূরণ দানের পোল্যান্ডের আহবান প্রত্যাখ্যান করে আসছে বলে মিঃ স্কুবিসেওস্কী জানান।

রুশ নেতা স্তালিনের সময় দেখা যায় পোল্যান্ডে ব্যপক হত্যাযজ্ঞের ঘটনা। অক্টোবর ১৯৮৯'র শেষের দিকে পোলিশ টেলিভিশনে গণকবরের ব্যাপারে বলা হয়, সেখানে ১৯৪৫

www.nagorikpathagar.com

থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে স্তালিনের নিপীড়নের শিকার হয়ে ৫শ' থেকে ৩ হাজার লোককে ওয়ারশ'র গণকবরে গোপনে সমাহিত করা হয়। টেলিভিশনে বলা হয়, সেন্ট ক্যাথাবিন গীর্জার আর্কাইভে ১৯৮৮ সালে গণকবরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। রাকোভিশ কারাগারে নিহত শত শত লোককে যেখানে কবর দেয়া হয় গীর্জার সমাধি ক্ষেত্রটি তার কাছেই অবস্থিত। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তা। রেকর্ড থেকে দেখা যায়, নিহত ব্যক্তিদের গীর্জার কাছে একটা কারাগারে হত্যা করার পর সদলেই কবর দেয়া হয়। এই কারাগারটি সে সময় পোল্যান্ডের গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তর ছিল।

ইতিমধ্যে পোল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী লেসেক ব্যালসা রোভিস তার দেশে একটি কঠোর মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনদান এবং এর আন্তর্জাতিক ভান্ডার গঠনের লক্ষ্যে একশ' কোটি ডলারের 'স্থিতিশীলতা ধন' দেয়ার জন্য পশ্চিমা সরকারের প্রতি আহবান জানান। শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর ব্যালসারোভিস পোল্যান্ডের পঙ্গু অর্থনীতিকে মুক্ত বাজারের ধাঁচে রূপান্তরিত করার জন্য একটি সময়সূচীর কথা প্রকাশ করেন। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পোল্যান্ডের জন্য নতুন মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। তিনি সংস্কারের লক্ষ্যে ওয়ারশ সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, 'এই স্বাধীনতার আহবানের প্রতি আমরা সাড়া দিতে পারি এবং অবশ্যই দিব। তবে তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পোল্যান্ড এখনও ওয়ারশ জোটের একটি সদস্য দেশ। যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সুবিধার মধ্যে পোল্যান্ড ১শত কোটি ডলারের নতুন ঋণ প্রদানের পথ উন্মুক্ত করা, ঋণ পূনর্বিন্যাস এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে রেহাই অন্তর্ভূক্ত।

পোলিশ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী তিক্ততা, কম্যুনিস্ট পার্টির নাম বদল ও ওয়ালেসার বিদায়

পোলিশ প্রধানমন্ত্রী মিকজিসল রকস্কী প্রথম দফার নির্বাচনে চরমভাবে বিপর্যস্ত হবার পর দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নেন। এমতাবস্থায় তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। ৬২ বছর বয়স্ক রকস্কী বলেন, তিনি এবং কম্যুনিস্ট পার্টির আরো ৩২ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও তাদের মিত্ররা ১৯৮৯'র ৪ঠা জুনের নির্বাচনে ৫০ ভাগ ভোট লাভে ব্যর্থ হবার পর তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না। এক বিবৃতিতে মিঃ রকস্কী বলেন, "আমি পরবর্তী দফার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তার এ বিবৃতিটি একজন ঘোষক রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে পাঠ করেন এবং পরে এ বিবৃতিটি সরকারী বার্তাসংস্থা পিএ পি প্রচার করে। তিনি বলেন, "গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সমাধান অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যাতে ভোটারদের ইচ্ছা পদদলিত নাহয়।"

www.nagorikpathagar.com

গোলটেবিল আলোচনার পর ১৯৮৯'র এপ্রিল মাসে সরকার ও বিরোধী সলিডারিটির মধ্যে সংস্কার চুক্তি সম্পাদনের জন্য যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মিঃ রকস্কী সভাপতিত্ব করেন। সলিডারিটি ট্রেড ইউনিয়নকে ৭ বছরের নিষেধাজ্ঞার পর পুনরায় বৈধ হবার অনুমতি দেয়া হয় এবং নির্বাচনের শর্তসমূহ নির্ধারিত হয়। কিন্তু তিনি নির্বাচনে ৪৮ শতাংশের সামান্য বেশী ভোট পান এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি বিরাট পরাজয় বরণ করে, পক্ষান্তরে সলিডারিটি যতগুলো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তার প্রায় সবগুলোতেই জয়লাভ করে। সুতরাং সে কারণেই পোল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দুমড়ে মুচরে পড়েন। তার আর ভবিষ্যৎ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সাধ জাগে না, তাইতো তিনি সরাসরি ঘোষণা দিয়েই ফেললেন, "আর নির্বাচনে যাবো না," এটাতেই কম্যুনিষ্ট নেতাদের যবনিকাপাত ঘটে পোল্যান্ডে।

দ্বিতীয়তঃ পোল্যান্ডের কম্যুনিষ্টগণ তাদের পার্টিতে পরিবর্তন আনা এবং পার্টির নতুন নামকরণের পক্ষে ব্যাপকহারে ভোট দেন। পলিব্যুরোর সদস্য লিসজক মিলার ২৩০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বলেন, 'পার্টির ভবিষ্যৎ প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটে শতকরা ৭২ জন পার্টির নাম, কর্মসূচী এবং বিধি বদ্ধ আইন পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তার মানে পার্টির বর্তমান কাঠামো সেকেলে এবং এটা নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে না। মিঃ সিলার বলেন, সাবেক ক্ষমতাসীন পার্টির ১১লাখ ৪০ হাজার সদস্য গণভোটে অংশ নেন। পার্টি ক্ষমতা হারানোর ক্ষতি কিভাবে দ্রুত পুষিয়ে নিতে পারে তা নির্ধারণের জন্য এবং প্রগতিশীল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রশ্নে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রায় ২১ লাখ ৬০ হাজার সদস্য রয়েছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪৫ বছর দেশ শাসন করে। ১৯৮৯'র জুনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে তারা সলিডারিটির কাছে পরাজিত হয়। মিঃ মিলার বলেন, কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দই সংস্কার পন্থী আর পার্টির অন্যান্য সদস্য রক্ষণশীল গণভোটের ফলাফল এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। তিনি বলেন, গণভোট প্রমাণ করে যে, পার্টির মধ্যে দ্রুত সংস্কার সাধন করতে হবে। আমাদের সংস্কার অব্যাহত রাখতে হবে। তবে সম্ভব অনেকেই আমাদের সঙ্গে আসতে চাইবেন না।

তৃতীয়তঃ পোল্যান্ডে গত ৪৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একজন অকম্যুনিষ্ট প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবার পর সলিডারিটি নেতা লেস ওয়ালেসা বলেন, তিনি তখন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন। স্বাধীনতা গণতন্ত্রের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত সরকার লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় তাঁর সংগ্রাম শেষ হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, "যে আদর্শাবলী প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এতদিন লড়াই করেছি, তা অর্জিত হয়েছে।" তিনি বলেন, নয়া প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই তাঁর সাহায্য পাবেন।

www.nagorikpathagar.com

এমন যেন না হয় অকম্যুনিস্ট সরকারে

পোল্যান্ডে কমরেডরা যখন ক্ষমতার মসনদে ছিলেন তখন তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার তথা কুক্ষিগত করণের অনেক ঘটনাই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। তার ছোট্ট একটি ঘটনায় নিম্নে দেখা যায়, পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ থেকে তিনশ' কিলোমিটার দূরে সসনোউইয়েক নামে একটি কয়লা খনি অঞ্চল। এই ছোট্ট শহরের কাছেই কাজি মিয়েরজ জুলিয়াস কয়লার খনি। খনির ভেতরে প্রায় সোয়া তেরশ' ফুট নীচে শ্রমিকরা কয়লা তুলছে। উপরে ফ্যাক্টরী কমিটির ছোট আরামদায়ক অফিসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে ফ্যাক্টরী কমিটির ম্যানেজার কমরেড সেক্রেটারী আন্তোনিন গোউলকা। প্রায় সব খনি এলাকায় একই দৃশ্য। পোল্যান্ডে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর এই খনির শ্রমিকরা দাবী করল ফ্যাক্টরী কমিটির প্রয়োজন নেই। কার্যত কারোর পদোন্নতির সুপারিশ করা, কাউকে অনুগ্রহ বিতরণ ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট পার্টির দৌলতে ফ্যাক্টরী কমিটির ম্যানেজার সদস্যদের কাজ ছিল। অথচ তারাও খনি শ্রমিক। খনিতে বিপজ্জনক কাজের জন্য সর্বোচ্চ বেতনধারী শ্রমিকের মত তারাও বেতন নিতেন; কিন্তু কোন কাজ করতেন না শুধু খবরদারী ছাড়া। এখন সময় বড্ড বদলেছে সুতরাং গোউলকা অফিস ছেড়ে এখন খনির নীচে কাজ করছেন। সলিডারিটির স্থানীয় নেতা আলেকজান্ডার বোরন তাকে বললেন, 'এভাবেই তোমার শেষ।' গোউলকাও যোগ্য জবাব দিল, তোমার ও একদিন এ অবস্থা হবে। খনি শ্রমিকদের অভিযোগ কোনরূপ কাজ না করে আলগা মাতব্বরি করে ফ্যাক্টরী কমিটির ম্যানেজার দস্তানা বদলানোর মত বছর বছর গাড়ী কিনছেন। আর বিশ বছর খনির নীচে কাজ করে আমরা কিছুই করতে পারি না।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণ হয় পোল্যান্ডে কম্যুনিস্ট নামধারী কমরেডরা ক্ষমতা থাকা কালে কেমন ছিলেন। একথাগুলো এজন্যই বললাম যে, কম্যুনিস্ট শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা যখন একদলীয় ভাবে কারো হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখনই দেখা যায় বৈষম্য বাড়ে অথচ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি দাবীদার কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এ রকম হবার কথা ছিল না। কম্যুনিস্ট শাসিত শাসন ব্যবস্থায় কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতি স্বজনপ্রীতির জন্ম নিয়েছিল। তাদের আদর্শের যখন ভালো রকম বালাই ছিল না তখন সেখানে কি আর আশা করা যেতে পারে। কম্যুনিস্টরা, সমাজতন্ত্রীরা একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পটু। গণতন্ত্রকে তারা ধুলিস্মাত করে দিতে দ্বিধা করে না। সুতরাং তাদের কাছে মানবমুক্তি আশা করা বাতুলতা মাত্র। ১৯৮৯ সালে চীনের ঘটনায় এক উদাহরণে দেখা যায়, এক কমরেড আমলা সেঝেছে, তার মধ্যে লোভ লালসার স্থান পেয়েছে এবং সে থেকেই অনেক বিলাসিতাপূর্ণ মালসামানা বাগিয়ে নেয়। তার মধ্যে এমন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা স্বাভাবিক কারণেই কেই বিশ্বাস করবে না। তার বাড়ীতে অল্পদিনে ভি,সি,আর, টেপ রেকর্ডার, ফ্রিজ, রঙ্গিন টিভি, শোভা পায়। উপরি আয়ের উপরোক্ত কমরেড আমলা প্রায়দিনই বাসার বাইরে রেস্টুরেন্টে তার পরিবার নিয়ে দুপুরের

www.nagorikpathagar.com

খাবার খায় নতুবা রাত্রের খাবার খায়। এজন্য তাকে হোটেল কর্তৃপক্ষকে কোন পয়সা দিতে হয় না। এগুলো এজন্য উদাহরণে টেনে আনা হয়েছে যে সল্লিডারিটি দল সবেমাত্র ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে, তাদের সামনে ক্ষমতাটিকে রাখার মানে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না, করা উচিতও নয়। কম্যুনিস্ট কমরেডরা যা করেছে তা যদি সল্লিডারিটির সরকারের প্রকাশ ঘটে তবে এমনতর অবস্থায় অঙ্কুরেই অকম্যুনিস্ট সরকারকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। তাদের সামনে অন্ধকার বৈ আর কিছু থাকবে না। সুতরাং অকম্যুনিস্ট সরকারে এমন কিছু যেন না হয় যদ্দরুন তাদের পতনকে তরান্বিত করে। পোল্যান্ডের অকম্যুনিস্ট সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা আনার অনেক যৌক্তিকতা রয়েছে কারণ সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট বিশ্ব তাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বিসমার্কের জার্মানীতে হিটলার এক কালো অধ্যায়ঃ এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান জাতি ছিল এক উচ্চাবিলাষী ও দুধর্ষ জাতি, দেশ হিসেবে জার্মান জাতিকে বিশেষ করে পূর্ব জার্মানীকে ইতিমধ্যে অনেক খেসারত দিতে হয়। অজস্র পরিবর্তন ও চুক্তির ইতিহাস নিয়ে আজকের জার্মানী নানা।ভাবে বিতর্কিত হয়ে রয়েছে। তাই বিতর্কিত ব্যাপার এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই অথচ প্রিন্স অটোডন বিসমার্ক ১৮৭০ সালের দিকে জার্মানীকে একত্রীকরণ করে একটা নতুন শক্তিরূপে গড়ে তুলে ছিলেন।

অদম্য শক্তির অধিকারী সেই জার্মানীকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক বিব্রতকর অবস্থার পড়তে হয়। ১৯১৯ সালের ২৮শে জুনের ভার্সাই চুক্তি তাদের মান সম্মানকে বিশ্বের বুকে নুইয়ে দেয়। তারা এই চুক্তির ১৫টি অংশে ৪৪০টি ধারায় এমনভাবে পরিগনিত হন যে, মহাঅপরাধী শক্তি হিসেবে আখ্যা পান। এতে তাদের মেনে নিতে হয় সীমানা, বিদেশে জার্মানীর ভূমি ও অধিকারসমূহ, সামরিক বাহিনীর বিলোপ সাধন, আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান, ক্ষতিপূরণদান, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য তার কাছ থেকে গ্যারান্টি গ্রহণ ইত্যকার রকমের অপমানের গ্লানির বোঝা। তার সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হলো, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা হলো, শাসিত এলাকা ও উপনিবেশসহ প্রায় ১লক্ষ বর্গমাইল ছেড়ে দিতে হলো এবং যুদ্ধ জাহাজ ও সমরাস্ত্র পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হলো।

এই চরম গ্লানিকর অবস্থা তারা বেশী দিন সহ্য করতে পারেনি। তাইতো ১৯১৯'র মধ্যে তাদের জাতীয়তাবোধ পূণঃ শক্তিশালী রূপেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ১৯৩৪'র জার্মানীর নির্বাচনে ইতিহাসে ধিকৃত নেতা হিটলার শতকরা ৯০ ভাগ ভোট পান। হিটলার তখন থেকেই প্রতিশোধ নেয়ার নিমিত্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কারও তোয়াক্কা না করে হিটলার ১ম মহাযুদ্ধের

www.nagorikpathagar.com

সেই বিখ্যাত চুক্তি (ভার্সাই চুক্তি) বাতিল করে দেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া উদ্বিগ্ন হলেও হিটলার জার্মান অধ্যুষিত অষ্ট্রিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহ দখলের চেষ্টা করে। ১৯৩৮ সালে জার্মান জাতি সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় এবং বিসমার্কের সাবেক জার্মানীতে পরিণত হয়। এই সময় থেকে হিটলার একক শক্তির অধিকারী এই ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে এক দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেন যা ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত।

আক্রমনকারী হিটলারের যুদ্ধের কিছু সংক্ষিপ্ত কথা।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ৩রা সেপ্টেম্বর,১৯৩৯'র এক দুপুরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বার লেইন কমন্স সভায় জানান যে, বৃটেন জার্মানীকে শান্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তাই ঐ দিনকে খুবই দুঃখের দিন বলে উল্লেখ করেন। চেম্বার লেইন বলেন, তার রাজনৈতিক জীবন ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তিনি জার্মানীকে শান্ত করতে পারেননি। ইতিপূর্বে জার্মানীরা ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসে। এডলফ হিটলার ৩রা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে জার্মান বাহিনীর আক্রমণ স্বচক্ষে দেখার জন্য বার্লিন ছেড়ে পোল্যান্ডের পথে রওয়ানা হন।

(ক) পোল্যান্ডে জার্মান ট্যাংক বাহিনীর প্রধান জেনারেল হেইনজ গুডেরিয়ান হিটলারকে নিয়ে নতুন দখলীকৃত এলাকা সফরে যান। চারডিভিশন সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১৫০ জন নিহত এবং ৭০০ জন আহত হওয়ায় নাৎসী নেতা হিটলার খুব সন্তোষ প্রকাশ করেন। হিটলার পোলিশ গোলন্দাজ বাহিনীর দুমড়ানো মোচড়ানো যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েউঠেন।

জার্মান ট্যাংক পোলিশ অশ্বারোহী বাহিনীকে ঘেরাও করে একেবারে তচনছ করে ফেলে। পোল্যান্ডের আবহাওয়া ভাল থাকায় জার্মান বাহিনী প্রতিদিন ৩০ মাইল করে ভিতরে এগুতে থাকে। ৫ই সেপ্টেম্বর জার্মান সেনাবাহিনীর প্রধান ফ্রাঞ্জ হালদার তার ডাইরিতে লেখেন–মূলতঃ আজই শত্রুদেরকে পরাস্ত করা হয়েছে। ৬ই সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী পোল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ক্র্যাকো দখল করে। ৮ই সেপ্টেম্বর তারা ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে ওয়ারশ'র শহর তলাতে পৌছে যায়। পোলিশরা বাস দিয়ে অধিকাংশ রাস্তা–ঘাটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ট্যাঙ্কের গোলায় পোলিশ রাজধানী ওয়ারশ সে সময় যেন গুড়িয়ে যায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোলিশ জেনারেলরা চুপচাপ বসা ছিল। আড়াই লাখ পোলিশ সৈন্য বিচ্ছিন্নভাবে সামান্য প্রতিরোধ করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের কপালে চূড়ান্ত দুর্যোগ নেমে আসে। যেসব এলাকায় জার্মান বাহিনী ঢুকতে পারেনি সেসব অঞ্চল দিয়ে সোভিয়েত বাহিনী

www.nagorikpathagar.com

পোল্যান্ডে আক্রমণ চালায়। মূলতঃ কয়েক মাস আগে নাৎসী সোভিয়েত নেতাদের নীল নকশার ভিত্তিতেই এই আগ্রসন চালান হয়। জার্মান বাহিনী ওয়ারশ ঘিরে রাখলেও ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা রাজধানী দখল করতে পারেনি। বিরাট বিরাট ট্রলি আবর্জনা গাদা আগুনে গুলী এবং স্বদেশী হাতে তৈরী গ্যাসোলিন বোমার দাপটে জার্মানীরা ওয়ারশ দখল করতে পারেনি।

হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং বহু মানুষ ভাঙ্গাচোরা ভবনের ধ্বংসস্তুপে ঢাকা পড়ে মারা যায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর একজন জার্মান অফিসার সন্ধির পতাকা নিয়ে ওয়ারশ যায় এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পনের চরমপত্র দেয়, তানাহলে গোলন্দাজ বাহিনী রাজধানী মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার হুমকী দেয়। পোলিশ বাহিনী জার্মান হুঁশিয়ারী না মানার পর ওয়ারশ'তে গোলাবর্ষণ শুরু করে। ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২ হাজার মানুষ মারা যায়, শহরের এক চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। বাকী অংশে আগুনের কুন্ডলিকায় ঢাকা পড়ে যায়। খাদ্যের আকাল পড়ে যায় এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তচনছ হয়ে যায়।

এর আগের মাসে (আগষ্ট) হিটলার তার সেনাধ্যক্ষদের বলেছিলেন এস, এস বাহিনীকে পোল্যান্ডে পাঠানো হবে নর-নারী, মহিলা ও শিশু এবং জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করার জন্য। জার্মানীর এস এস বাহিনীর বিশেষ ইউনিট ঘর থেকে ঘরে এবং শহর ঘুরে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় স্থানীয় কর্মকর্তা শিক্ষক, চিকিৎসক, অভিজাত শ্রেণী, ইহুদী, ধর্মযাজক এবং যে বা যারাই জার্মানদের বিরোধিতা করে তাদেরকে হত্যা করে। এস এস কর্মকর্তারা বার্লিনে প্রতিদিন ২শ' করে মানুষ গুলী করে মেরে দম্ভে ফেটে পড়ে। এর পরের বছর গুলোতে এ হত্যাকান্ড এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যা সভ্য মানুষের কল্পনার ও অতীত।

পোল্যান্ডের ঘটনার প্রেক্ষাপটে বৃটেন ও ফ্রান্স নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণার পর পোলিশ নাগরিকরা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং লন্ডন ও প্যারিসকে অভিনন্দন জানায়। বৃটিশরা এ যুদ্ধকে বিরক্তিকর যুদ্ধ। ফরাসীরা DROLE DE GUERRC এরং জার্মানরা SITZKRIEG বলে অভিহিত করে।

জার্মানীরা বৃটেনের উপরও হাত বাড়াবার দুঃসাহস দেখায়। হিটলার ১৯৪০ সালের ১৩ই আগষ্ট বৃটেনে বিমান হামলা শুরু করেন। জার্মান বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল গোয়েরিং বিমান হামলা শুরুর সেইদিনটির নামকরণ করেছিলেন 'ঈগল দিন'। হিটলার এর পুরোভাগের পরিকল্পনার নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন সীলায়ন' (সাগর চিতা অভিযান)। ১৩ই আগষ্ট দেড় হাজার জার্মান বিমান হানা দেয় ইংল্যান্ডে। এর পর প্রতিদিন শত শত হাজার হাজার বিমান হামলা চালায় বৃটেনে। বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ করা হয় ইংল্যান্ডের ওপর পাশাপাশি জার্মান নৌবহর সাগরে বৃটিশ নৌবহরের ওপর প্রচন্ড হামলা শুরু করে, বৃটিশ বাহিনী প্রচন্ড সাহসের সঙ্গে জার্মান হামলা প্রতিহত করে। ইংল্যান্ডের এই প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত বৃটিশ আকাশ সেনাদের সাহসী লড়াই ইতিহাসে অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

www.nagorikpathagar.com

জার্মান বৃটেন আক্রমণে ১ হাজার ৪শ' বোমারু এবং ১ হাজার জঙ্গী বিমান ব্যবহার করে। তখন বৃটেনে বোমারু ও জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ছিল ৯শ'রও কম এবং তা ছিল প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে জার্মানী বিমানের তুলনায় কম উন্নত মানের। হিটলার অন্যের সাফল্যেকে খাটো করে দেখতেন এবং অহংকারী ও ছিলেন বটে। যদ্দরুন ইংল্যান্ডকে অবজ্ঞা করে দেখাই তার অভ্যাস ছিল।

জার্মান বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল গোয়েরিং ব্যক্তিগতভাবে লন্ডন হামলা প্রত্যক্ষ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওপর যখন নির্বিচার বোমাবর্ষন করা হচ্ছিল তখন মার্শাল গোয়েরিং ৩শ' বোমারু এবং ৬শ' জঙ্গী বিমানের ছত্রছায়ায় লন্ডনের আকাশে আসেন বোমাবর্ষনের ব্যাপকতা দেখার জন্য। তিনি ইস্টএন্ডে জার্মান বিমান হামলার সাফল্য দেখে অত্যন্ত খুশী হন। সেদিন জার্মান হামলায় ইস্টএন্ডে ৩শ' বেসামরিক লোক নিহত ও প্রায় দেড় হাজর আহত হয়। অধিকৃত ফ্রান্সে ঘাঁটিতে ফিরে মার্শাল গোয়েরিং টেলিফোনে স্ত্রীকে বলেন, সমগ্র লন্ডন শহর জ্বলছে। তিনি বলেন, শুধু লন্ডনই আমাদের লক্ষ্য স্থল নয়, একই সঙ্গে লিভার পুল, বার্মিংহাম, নভেট্রি এবং বৃষ্টল ও আমরা তচনহ করে দেব।

হিটলার প্রথমেই ভাবতেন, ফ্রান্সের পতনের পর বৃটেন এককভাবে জার্মানীর হামলা প্রতিরোধ করতে পারবেনা। সহজেই বৃটেনের পতন ঘটবে। কিন্তু বৃটিশ পাল্টা হামলায় হিটলার হতাশ হয়ে পড়েন এবং বাধ্য হয়েই যুদ্ধ জয়ের আশা পরিত্যাগ করতে হয়। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে হিটলার বৃটেনে হামলা বন্ধের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন এমনভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তা থেকে সরে আসার কোন উপায় থাকেনা। যুদ্ধ বন্ধে হিটলারের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও জার্মান বৃটিশ বিমান যুদ্ধ নভেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ায়। যুদ্ধে জার্মানীর ১ হাজার ৭শ' ৩৩ টি বিমান ধ্বংস হয়। অপর দিকে বৃটেনের ৯শ' ১৫টি বিমান ধ্বংস হয়। যুদ্ধে একমাত্র লন্ডন শহরেই ৩০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। বৃটেন প্রচন্ড মার খেলেও যুদ্ধে এটা প্রমানিত হয়ে যায় যে, জার্মান বাহিনী অপরাজেয় নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও জার্মানীর পৃথকী করণ

জার্মানীদের পূর্ব ইউরোপ জয় করা প্রায় শেষ, আর এরই মধ্যে প্যোল্যান্ড ও বৃটেনকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। স্বাভাবিক কারণেই জার্মান বিরোধী পক্ষের দেশ গুলো এক হতে থাকে। যুদ্ধ যখন নানা দিক দিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে চলে যায় ঠিক তখনই বিরোধী দেশগুলো ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" ঘোষণা দিয়ে অন্যান্য জাতিগুলোর সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করে। ২৬টি দেশের এ ঘোষনায় বলা হয় কিভাবে জার্মানীকে দখল করা হবে, ধ্বংস করা হবে। কিভাবে তার ভবিষ্যৎ চলবে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা

www.nagorikpathagar.com

করা হবে এবং কোন কমিটি কোথায় বসে কাজ করবে ইত্যাদি। যুদ্ধকালের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চার্চিল রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনসহ আরো অনেকে। তেহরানের এ বৈঠকটি ১৯৪৩ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৪৫ সালেই ইয়াল্টা ও পটসডামে পর পর ২য় ও ৩য় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পটসডাম বৈঠকে পোল্যান্ড পূর্ব ইউরোপ এবং জার্মানীর বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানের জন্য ঐক্যমত হলে এর উদ্দেশ্যাবলীও উল্লেখ করা হয়। উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) জার্মানীর পুরো নিরস্ত্রীকরণ, অসামরিকীকরণ, সামরীক কারখানা অপসারন বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) জার্মানীদের মধ্যে 'অপরাধমূলক' ধারণা জন্মানো এবং এর দায়িত্ব তাদের বহন করতেহবে।

(৩) নাৎসী প্রতিষ্ঠান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং তার অঙ্গ সংগঠন বিলোপ করা।

(৪) গণতান্ত্রিক জার্মানী তৈরী করা এবং বিশ্ব শান্তির জন্য সহযোগীতা করানো।

এতে আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষযে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই চুক্তিটি করার কারণ হিসেবে দ্রুত কাজ করছিলো ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ। যাহোক ১৯৪৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জার্মানীকে তিনটি প্রধান মিত্র দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ভাগা ভাগির ব্যাপারটি সাব্যস্ত হয়ে যায়। একই সাথে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সীমা ও চিহ্নিত করা হয় এবং জার্মানীকে ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১৯৪৫ সালের ৭-৮ই মে জার্মানীরা প্রচন্ড আক্রমণের মুখে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। দখলদার ৪ শক্তির বাহিনী প্রধান এবং নেতৃস্থানীয় সামরিক অধিনায়কগণ তিনটি দলিলে দস্তখত করেন। এই শক্তিগুলো 'হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৩৭ সালে ৩১ শে ডিসেম্বর জার্মানীকে ৪টি দখলদার এলাকায় বিভক্ত করা হয়। অতঃপর মিত্র শক্তিদের মধ্যে কৌশলগত অবস্থান নেয়া বা পরিত্যাগ করার ঘটনা ঘটে এবং তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে পশ্চিমা শক্তি মেকলেন বার্গ, ম্যাক্সনী ও সুরিঙ্গিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। আর এই প্রভাবেই একটি রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করেছিলো। এটাই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই রাষ্ট্র মতবাদ (two state theory) বার্লিনের উভয় দিক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ঘটনার ফলে এটি সোভিয়েত দ্বীপ হিসাবে পরিগণিত হয় আর এ থেকেই আজকের বার্লিন সমস্যার উদ্ভব হয়।

১৯৪৫'র ২রা মে বার্লিনের পতন হয়। ১৭ই মে বার্লিন মিত্র শক্তির শাসনে চলে যায়। ২৫শে জুন তারিখেই সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকা দিয়ে পশ্চিমা শক্তির যাতায়াত নিয়ে বিরোধ

www.nagorikpathagar.com

দেখা দেয়। কেননা, বার্লিন পুরোপুরি সোভিয়েত দখলে ছিল। যদিও জার্মানীকে ৪ ভাগ করে ফেলা হয়–কিন্তু মূলভাগ ছিল পশ্চিমী দেশ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে। পশ্চিমা শক্তি গুলোর এলাকা ছিল বার্লিন থেকে ১০০ মাইল দূরে। মার্কিনীদের ধারণা ছিল যে সোভিয়েতরা তাদের বার্লিন প্রবেশে বাধা দেবে না। পরে একটা আপোষনামা হলেও কোন কাজ হয়নি। পূর্বাঞ্চলের সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজবাদী নীতিতে তার কাজ করা শুরু করে। সমস্যাটা বেঁধে গেলো বার্লিনকে নিয়ে। কেননা, জার্মানী তো আগেই পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে দখলদারিত্বের ভাগে বিভক্তহয়।

সভ্যতার নির্মম পরিহাস কলঙ্কিত বার্লিন দেয়াল

বাংলার আকাশে উদীয়মান সূর্য দেওয়ান ঈশা খাঁ প্রথম রাজধানী সোনারগাঁও ছেড়ে চলে আসেনবর্তমান কিশোরগঞ্জ সন্নিকটবর্তী জঙ্গল বাড়ী। অর্থাৎ ঈশা খাঁর দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে এখানেই তিনি রাজ প্রাসাদ গড়ে তুলেন। উক্ত রাজধানী মোগলদের নিকট থেকে হেফাজত করনার্থেই তার চতুস্পার্শে আরা বা খাল কাটা হয়। সে প্রেক্ষাপটে ছিল প্রতিরক্ষা তথা কল্যাণ কারিতার দিক। প্রাচীর বেষ্টিত নগরী রোম ও জেরুজালেমের কথা জানা যায়। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে অর্থাৎ মধ্যযুগে লন্ডন ও প্যারিসের অধিবাসীগণ তাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার জন্য নগরী দুটোর চার পাশে বার বার দেয়াল নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও নগরী বা রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য প্রাচীর নির্মানের অসংখ্য ঘটনার কথা জানা যায়। চীনের মহাপ্রাচীর তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিন্তু এ সবই প্রাচীন বা মধ্য যুগের ঘটনা। আধুনিক যুগে এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীর নির্মাণ করে নগরী সুরক্ষিত করার প্রয়াস অবাস্তব মনে হলেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু প্রাচীর যদি এমন হয় যে, প্রাচীরের একপার্শ্বে জেলখানা অপরাংশে মুক্ত এলাকা বা আলো অন্ধকারের সাথে তুলনা চলে তাহলে কেমন হবে। তাইতো দেখা যায় বহিঃ শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য বার্লিন প্রাচীর নির্মিত হয়নি। নগরীকে বিভক্ত করার জন্যই বার্লিন প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীরের এক পাশে নগরীর এক তৃতীয়াংশ উন্মুক্ত আলো হাওয়ার অঞ্চল, অপরাংশে দুই তৃতীয়াংশ অবরুদ্ধ, তমসাচ্ছন্ন। দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাধীনতা ও মুক্ত আলো বাতাসের শ্বাস নেয়ার আকুতিকে খর্ব করার জন্য নির্মানকরা হয়েছিল এই প্রাচীর বার্লিন মহানগরীকে বিভক্তকারী প্রাচীর।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী করুন ঘটনাটি ঘটে ১৯৬১ সালের ১৩ই আগষ্ট। আলাউদ্দিনের আশ্চার্য্য প্রদীপের মতই বার্লিনবাসীরা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, নগরীর অপর অংশে বসবাসকারী বন্ধু বান্ধব আত্মীয়–স্বজন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। এ দুঃখ, এ করুন আর্তি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত বার্লিন বাসীর। রাতারাতি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দ্বিখন্ডিত

www.nagorikpathagar.com

করা হয়েছে তাদের নগরীকে। কিছুদিন যেতে না যেতেই কাঁটা তারের বেড়ার স্থান গ্রহণ করলো কংক্রিটের প্রাচীর। প্রাচীর ওঠার আগেই পূর্ব বার্লিনের অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁটা তারের বেড়া টপকিয়ে পশ্চিমে পালানোর চেষ্টা করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত বার্লিন প্রাচীর তোলা হয় মূলতঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে আশ্রয় গ্রহণকারীদের দল ঠেকানোর উদ্দেশ্যে। বার্লিনকে ও জার্মানীকে দ্বিখন্ডিত করার পর নিরাপত্তা রক্ষীদের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও পূর্ব জার্মানরা দলে দলে পশ্চিমে চলে যেতে থাকে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, পূর্ব জার্মানী শ্রমিক স্বল্পতার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। পরিণতিতে কম্যুনিষ্ট শাসক চক্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়ে উঠে। ১৯৪৯ সালে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (পূর্ব জার্মানী) প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বছরে প্রতি বছর দুই লাখ ২৫ হাজার করে সর্বমোট ২৭ লাখ পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিমে চলে আসে। শুধুমাত্র ১৯৬১'র জুলাইতে ৩০ হাজার পূর্ব জার্মান দেশ ত্যাগ করে।

প্রাচীর নির্মাণ হওয়ার পর দেখা গেল প্রাচীর সংলগ্ন অনেক বাড়ীরই জানালা পশ্চিমমূখী হয়ে আছে। অনেক শরণার্থী ওই সকল জানালা দিয়ে প্রাচীরের পশ্চিমাংশে লাফিয়ে পড়েন। তাদের অনেকে ফায়ার নেটের ওপর ও অনেকে কংক্রিটের পেতমেন্টের ওপর পড়ে যান। অনেকে বেঁচে যান, কিন্তু অনেকে পতন জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেন। কম্যুনিষ্ট সরকার উক্ত জানালা গুলো ইট গেঁথে বন্ধ করে দেয়ার পর পূর্ব বার্লিন বাসিরা নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। প্রাচীরের নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁজে তারা পশ্চিমে পালাতে থাকেন। প্রাচীর নির্মাতারা এ সম্ভাবনা সম্পর্কে যে অজ্ঞ ছিলেন তা নয়। তাই সুড়ঙ্গ পথে পালানোর প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তারা প্রাচীর ঘেঁষে মাটির ২০ ফুট নীচে পর্যন্ত মাইনের শিকল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মানুষ মাইন এড়াবার জন্য ২০ ফুটেরও বেশী নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করেন। তবে সবচেয়ে দুঃসাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন প্রাচীর টপকিয়ে পালানোর চেষ্টা যারা করেছে তারা। তাদের সরাসরি 'ফ্যাসিই বিরোধী রক্ষাব্যূহ' (কম্যুনিষ্ট সরকার বার্লিন প্রাচীরকে এ নামেই অভিহিত করতো) ভেদ করতে হতো। রাতের অন্ধকারে সার্চ লাইটের আলো এবং বুলেট বৃষ্টির মত বাঁধা উপেক্ষা করে তারা এঁকে বেঁকে ছুটে যেত প্রাচীরের দিকে। অতঃপর প্রাচীর টপকানোর প্রয়াস। সে প্রয়াসে খুব কম মানুষই সফল হয়েছে। কিন্তু সাফল্য এখানে বড় কথা নয়। মুক্তি ও স্বাধীনতার যে অবিস্মরনীয় আকাংখা তাদের এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাই বড়ো। এ ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রচার পেয়েছিল পিটার ফিখটারের পলায়ন প্রয়াসের ঘটনাটি। ১৮ বছর বয়স্ক পিটার ফিখটার ছিল পূর্ব বার্লিনের এক রাজ মিস্ত্রি। প্রাচীর টপকানোর সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের মেশিনগানের গুলিতে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পশ্চিম বার্লিনের পুলিশ ও সাংবাদিকদের চোখের সামনে পড়ে থাকে এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে। অবশেষে যখন পূর্ব জার্মান সীমান্ত রক্ষীরা ফেখটারের দেহটি প্রাচীর থেকে নামিয়ে নিয়ে যায় তখন রক্ত ক্ষরণে তার

www.nagorikpathagar.com

মৃত্যু হয়। অনুমান করা হয়, বার্লীন প্রাচীর টপকিয়ে পালানোর সময় ৭৫ জন মৃত্যুবরণ করে। ফেখটার এই ৭৫ জনেরই একজন।

বার্লিন প্রাচীরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বার্লিন বা জার্মানীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, জার্মানীর গন্ডি ছাড়িয়ে আরো বহু দূরে এটা ব্যাপ্ত হয়েছে। সমগ্র ইউরোপের বিভক্তির কারণ হয়েছিল এই কলংকিত প্রাচীর। এই প্রাচীরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে পশ্চিমা মিত্র জোট ও ওয়ারশ চুক্তি জোটের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধে। জন এফ কেনেডীর অবিস্মরণীয় ভাষণ। ইফ আই হ্যাভ বিন এ্যান বার্লিনার'– এরপর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য পশ্চিমা নেতার কাছে এটা হয়ে ওঠেছিল এক ঘৃণার প্রতীক। তারা বার বার এর ধ্বংস চেয়েছেন, যারা এটা নির্মান করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করেছেন সুতীব্র ঘৃণা। বার্লিন প্রাচীর ২৮ বছর ধরে পূর্ব বার্লিন বাসীদের আবদ্ধ করে রেখেছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এটা এই পারমানবিক যুগের স্বৈর শাসকচক্রের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি আপাতঃ দৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও আরেকটি ব্যাপারও সত্য যে, বার্লিন প্রাচীর ইউরোপের স্থিতিশীলতার এক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। বার্লিন প্রাচীর ছিল বলেই পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার দেহে একটা গভীর ক্ষত।

কম্যুনিস্ট শাসন অবসানে বিক্ষোভ মিছিল ও পূর্ব জার্মান ত্যাগের ব্যাপক হিড়িক

বার্লিন নগরী তথা পূর্ব জার্মানী পুরোটাই ছিল সোভিয়েত বলয়ভুক্ত। কম্যুনিষ্ট বলয়ভুক্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী ছিটে ফোটা দু'একটি দেশও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের ধ্বস নামায় কম্যুনিষ্ট ব্লকের নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণ যেমন বসে থাকেনি তেমনি পূর্বজার্মানীর জনগণ মুক্তির দিগন্তে পা বাড়াবার লক্ষ্যে ভুল করেনি। তাদের ২৮টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অনেক কষ্টে সাধ্যে। তাদের আহাজারী, আকুতি, মিনতীকে কম্যুনিষ্ট সরকার তোয়াক্কা করেনি, এমন কি আমল ও দেয়নি। প্রাচীর দ্বারা বিভক্তি করণের ফলে পূর্ব বার্লিনবাসীর আর্তি আরো বেড়ে যায়। কি করে এত বড় শাস্তিকে মেনে নেয়া যায়। দেশ বিভক্ত হয় না হয় সেটা ভিন্ন কথা, তাতে একটা নিয়ম পদ্ধতির বালাই থাকে এবং এতটুকুন পরিবার গত ভাবে হতাশা থাকে না। রাষ্ট্র পর্যায়ের একটা পদ্ধতির মাধ্যমে আসা যাওয়া করা যায়। কিন্তু বার্লিন প্রাচীরে কি এনে দিয়েছিল তা ১৯৮৯'র বিক্ষোভ মিছিলেই তার প্রমাণ মেলে। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই যুগের এই সময়ে বার্লিনবাসীরা বন্দী জীবন কাটালেও একদম নিরবে নিভৃতে তাদের জীবন জীবিকা বয়ে যায়নি। পূর্ব জার্মানীরা বিদ্রোহ করলো দেশের

www.nagorikpathagar.com

শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেউ কেউ হয়তো ভিন্নদেশে যেয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছে। আর এই বিচ্ছিন্নতা বার্লিন বাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে।

প্রায় এক দশক পূর্বের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সংস্কার আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের কবর রচনা ভূমিকায় অবতীর্ন, বর্তমান বিশ্বের আলোচিত ব্যক্তিত্ব রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনষ্টের কার্যক্রমের প্রতি আস্থাহীন হয়েই পূর্ব জার্মানীর জনগণ ১৯৮৯ সালে বিক্ষোভের পর বিক্ষোভ মিছিলে ফেটে পড়ে। পাশা পাশি পোল্যান্ডের যে ব্যাপক পরিবর্তন তা তাদেরকে সঙ্গত কারণেই নাড়া দেয়। সমাজতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নের এই সময়ে পূর্ব জার্মানবাসীর ভূমিকা বিশ্বের মুক্তিকামী জনতাকে আশার সঞ্চার করেছে।

নিম্নে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত মাত্র স্বল্পসময়ের ব্যবধানে মিছিল দেশও ত্যাগের যে রেকর্ড গড়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি তুলে ধরা হলোঃ-

(১) ১৩-৯-৮৯'র দৈনিক ইত্তেফাকে বলা হয়, পশ্চিম জার্মানীর পথে পূর্ব জার্মানীর শরনার্থীদের অন্তহীন স্রোত অব্যাহত রয়েছে। মুক্ত জীবনের আশায় পশ্চিমে পাড়ি দেয়ার জন্য আরও ১৬ হাজার পূর্ব জার্মান ইতিমধ্যে হাঙ্গেরীতে পৌছেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১২-৯-৮৯) দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার পূর্ব জার্মান শরনার্থী পশ্চিম জার্মানীর বাভেরিয়ান প্রদেশের সীমান্ত শহর পাসাউ পৌছে। পশ্চিম জার্মানীর দক্ষিণাঞ্চলীয় বাভেরিয়ান প্রদেশের সীমান্ত পুলিশ জানায় হাঙ্গেরী তার সীমান্ত খুলে দেযার পর এ পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশী পূর্ব জার্মান শরনার্থী পশ্চিম জার্মানীতে প্রবেশ করেছে। গত রোববার (১০-৯-৮৯) পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার পূর্ব জার্মান নাগরীক ছুটি কাটানোর জন্য হাঙ্গেরীতে পৌছে এবং এদের মধ্যে ২৬ হাজার দেশে ফিরে গিয়েছে বলে বুদাপেষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান।

(২) ১৮-৯-৮৯'র দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, পশ্চিম জার্মানীতে যাওয়ার জন্য পূর্ব জার্মানীরা চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে নদী সাতরিয়ে হাংগেরীতে যাচ্ছে। চেক সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টার দায়ে চেকোশ্লোভাক সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ব জার্মানে ফেরত পাঠানো হয়ে থাকে। পরে পূর্ব জার্মান প্রজাতন্ত্র থেকে পলায়নের অপরাধে তাদের বিদায়ের সম্মুখীন হতে হয়।

(৩) দৈনিক ইনকেলাবের ১১-১০-৮৯'র তারিখে বলা হয় পূর্ব জার্মানীতে কট্টর মার্ক্সবাদী পদ্ধতির সংস্কারের দাবীতে সোমবার (৯-১০-৮৯) রাতে প্রায় ৭০ হাজার লোক শিল্প শহর লিপজিগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৫৩ সালে এক ব্যর্থ কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থানের পর এটাই দেশের একক বৃহত্তম বিক্ষোভ। অনেকে ব্যানার বহন করছিল তাতে লেখা ছিল, আমরা সহিংসতা চাইনা, সংস্কার চাই'। এর আগে কট্টর কম্যুনিষ্ট নেতা এরিখ হোনেকার কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, তিনি কোন অসন্তোষ বরদাশত করবেন না। তিনি সংস্কারের

www.nagorikpathagar.com

আহবানকে চীনে গণতন্ত্রপন্থী অভ্যুত্থানের সাথে তুলনা করেন, যা সৈন্য ও ট্যাংক দ্বারা দমন করা হয়। তিনি বলেন, পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিজমকে ধ্বংস করার যে কোন চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

(৪) ১৮-১০-১৯৮৯ তারিখে দৈনিক জনতায় প্রকাশ করা হয়, লিপজিগে গত সোমবার (১৬-১০-৮৯) রাতে ১লাখ ২০ হাজারের বেশী গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পূর্ব জার্মানীর ৪০ বছরের ইতিহাসে এটাই ছিল বৃহত্তম প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ। তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অবাধ নির্বাচনের দাবীতে প্লাকার্ড বহন করে। এই বিক্ষোভের ফলে সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সরকারের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সেন্টলুকের একটি গির্জার ধর্মযাজক টেলিফোনে পশ্চিম জেডডি এক টেলিভিশন নেটওয়ার্কে জানান, ৩ ঘন্টাব্যাপী এই বিক্ষোভ মিছিলে ১লাখ ২০ হাজারেরও বেশী লোক অংশ নেয়। কিছু কিছু বিক্ষোভকারী তরুনদের কাছে ক্ষমতা দাও এবং 'এরিখ সংস্কার' সাধন কর, অথবা 'অবসর নাও' বলেও শ্লোগান দেয়। পূর্ব জার্মানীর টেলিভিশন এই প্রথমবারের মতো বিক্ষোভের খবর দ্রুত প্রচার করলো।

সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ভিয়াসলসাভ দাশিচেতকে পূর্ব জার্মানীর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জেডডি এফকে বলেন, সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেরই পুরানো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা দরকার। স্ট্যালিনের পুরানো সমাজতান্ত্রিক মডেল আজ মৃত। কেউই এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেনা।

(৫) ১৩-৯-৮৯'র দৈনিক সংবাদের খবর অষ্ট্রিয়া বলেছে যে, দশ হাজারেরও বেশী পূর্ব জার্মান শরনার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। হাঙ্গেরী গত রোববার (১০-৯-৮৯) মাঝ রাতে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে তাদের সীমান্ত খুলে দেয়ার পর এরা অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। এই ব্যাপক দেশত্যাগ অব্যাহত থাকার সময় হাঙ্গেরী কর্তৃপক্ষ পশ্চিম জার্মানীতে যাবার জন্য যে সব শিবির খুলেছিল, তার একটি বাদে অন্য সবক'টি বন্ধ করে দিচ্ছে।

(৬) ১৮ ই অক্টোবর ১৯৮৯ তে দৈনিক সংগ্রামে উল্লেখ করা হয়, পূর্ব জার্মানীর শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রধান গতকাল (১৭-১০-৮৯) জানান, শ্রমিকরা একটা পরিবর্তনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। তবে ত্বরিত ব্যবস্থা অথবা কোন ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে সংস্কার সাধিত হলে তা মারাত্মক হতে পারে। ৯০ লাখ সদস্য বিশিষ্ট শক্তিশালী এক ভিজিবি ইউনিয়ন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান হেরী টিশচ কম্যুনিস্ট ইয়থ ডেইলি জাংওয়েল্টকে জানান, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই বর্তমান পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনা কর। তিনি জানান, আমরা অবশ্যই সতর্কতার সাথে অধিকার আদায় করে নেব। আমরা যদি খুব অস্থির হয়ে পড়ি তাহলে সংকটে পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.com

(৭) দৈনিক ইত্তেফাকে ২৫-১০-৮৯তে বলা হয়, পূর্ব জার্মানীতে গণতন্ত্রের দাবীতে দুই লক্ষাধিক লোক গত সোমবার (২৩-১০-৮৯) দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী লিপজিংয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অপর ৩টি নগরীতেও হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানায়। সোমবারের বিক্ষোভ ছিল কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তম প্রতিবাদ। বিক্ষোভকারীরা স্বাধীন নির্বাচন এবং বিদেশে স্বাধীন ভাবে ভ্রমনের অধিকারের দাবীতে শ্লোগান দেয়। প্রোটিষ্ট্যান্ট গীর্জাসূত্রে সোমবারের বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দুই লক্ষাধিক বলে উল্লেখ করা হয়। লিপজিংয়ে ফরাসী বেতারের একজন সাংবাদিক এই সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশী বলে উল্লেখ করেছেন।

(৮) ৬-১০-৮৯'র দৈনিক জনতার খবর, প্রায় ১শ' ৩০ জন পূর্ব জার্মান নাগরিক অত্যন্ত সাহসীকতার সংগে নদী সাঁতরে ও পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পশ্চিমে পাড়ি জমানোর জন্য পশ্চিম জার্মানী দূতাবাসে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

(৯) দৈনিক সংগ্রামের ৪-১১-৮৯ তারিখে উল্লেখ করা হয়, প্রাগে অবস্থিত পশ্চিম জার্মান দূতাবাসে প্রায় সাড়ে তিনহাজার পূব জার্মান নাগরীক সমবেত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২-১১৮৯) রাত ধরে দেশ ত্যাগের পর তারা দূতাবাসে ভিড় করে। চলতি বছর (১৯৮৯) ১লা জানুয়ারী থেকে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত মোট এক লাখ ৬১ হাজার ৪৬৫ জন পূর্ব জর্মান নাগরীক পশ্চিম জার্মানীতে পৌছেছেন। এদের মধ্যে এক লাখ লোকের বহির্গমন সংক্রান্ত সরকারী কাগজপত্র রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন পূর্ব ইউরোপীয় দেশ বিশেষ করে পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানিয়া থেকে আরো ২লাখ ৬২ হাজার জার্মান বংশোদ্ভুত লোক পশ্চিম জার্মানীতে এসেছে।

এ রকম মিছিলও দেশ ত্যাগের খবর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় এসেছে। সে অনুযায়ী বলা চলে পূর্ব জার্মানীর এ ব্যাপক পরিবর্তন রেকর্ড করেছে।

১৯৮৯'র ৯ই নভেম্বরের বার্লিন দেয়াল ভাঙ্গন এক মধুর মিলনের গাঁথা সূত্র

৯ই নভেম্বর, ১৯৮৯'র মধ্যরাত। প্রবল গর্জনে যেন কেঁপে উঠলো বিশ্ব। কি হয়েছে। কম্যুনিষ্ট নিপীড়নের প্রতীক, ২৮ বছর ধরে নিষেধাজ্ঞা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বার্লিন প্রাচীরের দুই পাশে হাজার হাজার জার্মান পশ্চিম জার্মানের বাসিন্দারা পূর্ব জার্মানবাসীদের টেনে হিচড়ে নিয়ে আসছে বার্লিন প্রাচীর পার করে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে বুকে। স্বপ্নের মত অভাবিত সব কিছুই যেন বাস্তবে ঘটতে শুরু করেছে। মিলনের এক অপূর্ব সুযোগ অথচ এই

www.nagorikpathagar.com

নিকট অতীতেও বার্লিন প্রাচীর টপকে পশ্চিমে পালাতে গিয়ে গুলীবদ্ধ হয়েছে বহু সংখ্যক পূর্ব জার্মান নাগরীক। গত ২৮ বছর ধরে এই বার্লিন প্রাচীর এক সময়ের এক গৌরবোজ্জ্বল ইউরোপীয় রাজধানীর কেন্দ্র বরাবর ২৮ মাইল দীর্ঘ এক কুৎসিত ক্ষত চিহ্নের মত বিরাজমান ছিল। ইউরোপ এবং বিশ্বে বিভক্তির প্রতীক সেই বার্লিন প্রাচীর এখন আর নেই। যদিও প্রাচীরটি এখনও দৃশ্যমান রয়েছে কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে নেই প্রাচীরের নিষেধাজ্ঞা, বাধা। হাতুড়ী আর কাস্তের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে বিশাল সেই প্রাচীর। বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়ার এই ঘটনাটিকে বাস্তিল দুর্গের পতনের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। 'দৈনিক বিজেড-'র শিরোনামে বলা হয়, "বার্লিন আবার সেই বার্লিন।"

পূর্ব জার্মান কর্তৃপক্ষ পশ্চিমে গমনের ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে গত ৯ই নভেম্বর মধ্যরাতে দুই জার্মানের বাসীন্দাদের মধ্যে মহামিলনের এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তীব্র রাজনৈতিক সংকট ও গণতন্ত্রের দাবীতে ব্যাপক গণঅসন্তোষের মুখে কর্তৃপক্ষ এই নজির বিহীন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। সীমান্ত খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ আনন্দ প্রকাশের জন্য পশ্চিম বার্লিনে সমবেত হতে শুরু করে। কেবল পূর্ব বার্লিনেরই ৫০ হাজার লোক গত ১০-১০-৮৯ তারিখে পশিম বার্লিনে পৌঁহান। বহু লোক বার্লিন প্রাচীরের উপরে আনন্দে নৃত্য করতে থাকে।

প্রায় আড়াই যুগ পর পূর্ব বার্লিনের নাগরিকরা যেন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে। দ্বার যখন উন্মুক্ত হলো পূর্ব বার্লিনবাসীদের তখন কি আনন্দ। বাধ ভাঙ্গা স্রোতের মত জনতার ঢল ছুটে চললো প্রাচীর অভিমুখে। এই প্রাচীর পার হতে গিয়ে কত মানুষকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই প্রাচীর যখন খুলে দেয়া হয় তখন আনন্দ বিহ্বল মানুষ নাচতে নাচতে গাইতে, গাইতে প্রাচীর পার হতে শুরু করে। কেউ তাদের পরিচয় পত্র দেখতে চাইলোনা, কেউ পালিয়ে যাচ্ছে কি না সেদিকেও কোন রক্ষীর সতর্ক দৃষ্টি নেই। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে তখন অনেকে আনন্দের বেগ সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেললো। জনতার হাসি-উল্লাস দেখে মনে হয়েছে কোন জন্মদিনে এত আনন্দ থাকে না, কোন ফুটবল ম্যাচে জয় লাভের পরও এত উচ্ছাস থাকে না। এমনি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ছিল বার্লিন প্রাচীরের পাশে।

বার্লিন আবার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে পড়েছে। শতাব্দীর অধিককাল থেকে বিভিন্ন শক্তির ব্যারোমিটার স্বরূপ উত্থান-পতনের লীলাভূমি এই বার্লিন। লৌহ যবনিকার অন্তরালে গত চার দশক থেকে পশ্চিম বার্লিন পাশ্চাত্য মূল্যবোধ, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের ঘাঁটি হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু পূর্ব জার্মানরা বার্লিন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে পাড়ি দেয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ব ইউরোপে বিস্ময়কর রাজনৈতিক সংস্কারের ঢেউ খেলেছে।

www.nagorikpathagar.com

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ৪টি বৃহৎ শক্তির মৈত্রী জোটের নির্দেশক্রমে বার্লিন নগরী বিভক্ত হয়েছিল। বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্তের ব্যাপারে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো যে ভাবে খবর প্রকাশ করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া গেলঃ-

দৈনিক ইত্তেফাকের ১১ই নভেম্বর ১৯৮৯'তে বলা হয় 'পূর্ব জার্মান সরকার গত বৃহস্পতিবার (৯-১১-৮৯) বার্লিন প্রাচীর খুলিয়া দিয়াছেন। তীব্র রাজনৈতিক সংকট ও গণতন্ত্রের দাবীতে ব্যাপক গণঅসন্তোষের মুখে কর্তৃপক্ষ এই নজির বিহীন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। সীমান্ত খুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ আনন্দ প্রকাশের জন্য পশ্চিম বার্লিনে সমবেত হইতে শুরু করে। কেবল পূর্ব বার্লিনেরই ৫০ হাজার লোক গত শুক্রবার (১০-১১-৮৯ ইং) পশ্চিম বার্লিনে পৌছান। বহু লোক বার্লিন প্রাচীরের উপরে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। দীর্ঘ ২৮ বছরের এই বাধা আকস্মিকভাবে মুক্ত হওয়ায় বহু লোক প্রথম সুযোগেই পশ্চিম বার্লিন গিয়া আবার ফিরিয়া আসে।

একই তারিখের দৈনিক সংগ্রামে উল্লেখ করা হয়, পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট শাসকরা গত বৃহস্পতিবার (৯-১১-৮৯) অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেশের সকল সীমান্ত পথ শর্তহীনভাবে খুলে দিলে ঐদিন রাতে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের নাগরীকদের মধ্যে সীমান্ত পারাপারের এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা ঘটে। নাটকীয় ঐ সিদ্ধান্তের পর এক সময়ের ভীতি জনক বার্লিন প্রাচীর অতিক্রম করে উভয় পার্শ্বের জার্মান নাগরীকরা পরস্পরের ভূ-খন্ডে প্রবেশ করতে শুরু করে। পূর্ব জার্মান নেতাদের এক জরুরী বৈঠকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত এবং সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণার ফলে দেশে পরিবর্তনের দাবীতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে বিপুল আনন্দ উল্লাসের ঢেউ বয়ে যায়। তারা হর্ষোৎফুল্ল ফুটবলামোদীর মতো কে আগে পশ্চিম বার্লিনে পৌছবে। সেই বৃহস্পতিবার রাতে ৫০ হাজারেরও বেশী পূর্ব-বার্লিনবাসী পশ্চিম-বার্লিনে চলে গেছে। এটা হচ্ছে পূর্ব-জার্মান নাগরীকদের এ যাবৎ কালের বৃহত্তম দেশ ত্যাগের ঘটনা। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে অবরুদ্ধ পূর্ব-জার্মানীর নাগরীকদের অনেকেই শুধুমাত্র অপর অংশটি একনজর দেখার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে। স্থায়ীভাবে দেশত্যাগের ইচ্ছে তাদের নেই।

১৩-১১-৮৯ তারিখের দৈনিক ইনকেলাবে প্রকাশ করা হয়, পূর্ব জার্মান কর্তৃপক্ষ বার্লিন প্রাচীরে আরেকটি নির্গমন পথ খুলে দিয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মেয়ররা গতকাল (১২-১০-৮৯) প্রাচীরের মধ্যদিয়ে নতুন পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পোটসড্যান স্কোয়ারে মিলিত হন। ১৯৬১ সালে প্রথম বার্লিন প্রাচীর নির্মীত হবার পর এই প্রথম দুই মেয়র বিভক্ত নগরীর পূর্ব-পশ্চিম সীমানা রেখায় মিলিত হলো। দুই মেয়র যখন গতকাল (১২-১১-৮৯) নতুন নির্গমন পথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে করমর্দন করছিলেন তখন অপেক্ষমান হাজার হাজার লোক উল্লাসে ফেটে পড়ে। নতুন প্রবেশ পথটি খুলে দেয়ার এক মিনিট পরই তা আবার বন্ধ করেদিতে হয়। কারণ জনতার ভিড় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, চাপ নিয়ন্ত্রন করা কঠিন হয়ে

www.nagorikpathagar.com

পড়ে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মান সীমান্ত প্রহরী পুলিশ ও শ্রমিকরা বার্লিন প্রাচীরে ১৫ মিটার দীর্ঘ পথ উন্মুক্ত করার জন্য ক্রেন নিয়ে সারারাত ধরে কাজ করে। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যদিয়ে প্রথম নতুন প্রবেশ পথ খোলা হয় গত শনিবার (১১-১০-৮৯)

পশ্চিমে জার্মান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ভন ওয়াইজাস্যাকায়ের পরিস্থিতি নিরুপনের জন্য গতকাল (১২-১১-৮৯) পশ্চিমে বার্লিন যাবার কথা, পূর্ব জার্মানী জার্মান সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন স্থানে জনতার ভিড় এড়ানোর উদ্দেশ্যে সপ্তাহের শেষ দিকে আরো প্রবেশ পথ খোলা হবে। গত শনিবর ১১-১১-৮৯) দশ লাখ পূর্ব জার্মান নাগরীক পশ্চিম জার্মানী চলে যায়। কর্তৃপক্ষ জানায় গতকাল (১২-১১-৮৯) এই সংখ্যা আরো বেশী ছিল। পশ্চিমে জার্মান সীমান্ত পুলিশ জানায়, পূর্ব জার্মান থেকে আগত যানবাহনের সারিছিল ৬০ কিলোমিটার।

ভিসা প্রদানের ব্যাপারে দৈনিক সংগ্রামের ১৫-১১-৮৯'র সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়, পূর্ব জার্মান কর্মকর্তারা বলেছেন, সে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশকেই পশ্চিমে সফরের ভিসা হয়েছে পূর্ব জার্মান বার্তা সংস্থা বলেছে যে, গত বৃহস্পতিবার (৯-১১-৮৯) দেশের সীমান্ত উন্মুক্ত করার পর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ৫৭ লাখ ভিসা ইস্যু করেছেন। বার্তা সংস্থা বলেছে যে, এর মধ্যে ১২ হাজারের কম লোক স্থায়ী অভিবাসনের জন্য আবেদন করেছেন। সীমান্ত উন্মুক্ত করার আগে যে হাজার হাজার পূর্ব জার্মান দেশ ত্যাগ করেছেন, তার তুলনায় এ সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। এদিকে পূর্ব জার্মানী কর্তৃপক্ষ বার্লিন প্রাচীরের আরো দুটো পথ খুলে দিয়েছেন। পূর্ব জার্মান নাগরীকরা এখনও পশ্চিম বার্লিনে যাচ্ছেন। বার্তা সংস্থা বলেছে যে, এ সপ্তাহে (৯-১১-৮৯ ও ১৪-১১-৮৯) আনুমানিক ২০ লাখ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। সে তুলনায় এ সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে।

পালা বদলের হাওয়ায় পূর্ব জার্মান ও এরিক হোনেকারের বিদায়

দুই হাজার সালকে আমেরিকার শতাব্দী বলা হয়, তবে এ শতাব্দীকে সোভিয়েত শতাব্দী হিসেবেও স্মরণ করা যেতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে উদ্ভুত ঘটনা প্রবাহ দু'দুবার চূড়ান্তভাবে ইতিহাসের গতিধারাকে পরিবর্তন করেছে।

বিশ্বরাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনটি সিদ্ধান্ত পৌছাসম্ভব হতে পারে সেগুলো পরস্পর বিরোধী নয় বরং পরস্পরের অধিকতর পরিপুরক। একটি আদর্শগত সিদ্ধান্ত সমাজতন্ত্রের বিশাল ব্যর্থতার উপরই গুরুত্বারোপ করবে। উনবিংশ শতকের ইউরোপের ২টি স্বপন ছিল একটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং অপরটি আমেরিকা। দু'টোর যে কোন একটা বিশ্বকে তার মত করে গড়ে তুলতে অথবা একটি নতুন জাতিতে যোগদানের মাধ্যমে নিজেদের

www.nagorikpathagar.com

ব্যক্তিগত জীবনকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আমেরিকা বলতে কেউ যদি গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ বুঝান তাহলে তার জয় হয়েছে এবং সোভিয়েত মার্ক্সীয় ধাচের সমাজতন্ত্র মার খেয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পালা বদলের হাওয়া শুরু হয়েছে। কয়েক যুগের সমাজতান্ত্রিক শাসন সেখানে যেন নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, প্রতিটি দেশের জনপদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার উচ্চকিত দাবী। মানবতাবাদী গ্রুপ ও ভিন্নমতাবলম্বীরা সোচ্চার হওয়ার সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিরোধী দল গড়ে ওঠতে শুরু করেছে। লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে প্রতিবাদী কন্ঠগুলো মুক্ত আলো-বাতাসে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে একদলীয় শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় শাসনের ধারার অনুসৃতি চলছে। অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ ও অবশেষে সম্মতি প্রকাশ করে 'পেরেস্ত্রয়কা' ও 'গ্লাসনষ্ট' নীতির পথ ধরেন; কিন্তু তাতেও মানুষের ওপর একদলীয় শাসনের অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টীমরোলার চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে মানুষের ধৈয্যের বাধ যেন ভেঙ্গে যায়।

যাহোক সমাজ বদলের এই ধারা শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা বুদাপেষ্ট থেকে ওয়ারশ-এ গিয়ে পৌছে। হাঙ্গেরীতে অতিসম্প্রতি (১৯৮৯) কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে দেয়া হয়। সেখানে নতুন দল গঠিত হয়। পোল্যান্ডে ইতিমধ্যে অ-কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ায়ও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। চেক জনগণ সামগ্রীক সংস্কারের দাবীতে ক্রমে সোচ্চার হয়ে উঠে।

১৯৮৯ সালে পূর্ব জার্মানী ও রুমানীয় কর্তৃপক্ষ হাওয়া বদলে কম্যুনিষ্ট ধ্যান-ধারণা থেকে এক চুল ও সরে আসতে নারাজ বলে জানা যায়। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ আমন্ত্রিত হয়ে পূর্ব জার্মানীর ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৯৮৯'র ৬ই অক্টোবরের এই দিনে গর্বাচেভ পূর্ব জার্মানীর দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ কালের প্রেসিডেন্ট এরিখ হোনেকারের সাথে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু হোনেকার যেন নাছোড় বান্দা। তিনি পরিবর্তনের পক্ষে গর্বাচেভের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পরিবর্তনের পেছনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, তিনি তার দেশে আগের ধারাই অনুসরণ করে যাবেন, কিন্তু তাঁর এ মনোভাব কি, জনগণের মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ, বাস্তবতা বলে, না এ মনোভাব জনগণের মনোভাব নয়। তাই দেখা যায়, সংস্কার বাদী গোষ্ঠীগুলো সেখানে আরো সক্রিয় হয়ে উঠে। মিছিলও বিক্ষোভের দেশে পরিণত হয় যেন পূর্বজার্মানী।

'আমাদের স্বাধীনতা দরকার', 'আমরা সংস্কার চাই-এই শ্লোগান পূর্ব জার্মান নাগরীকদের। এই শ্লোগানে পূর্ব জার্মান মুখরিত। বিক্ষোভ, মিছিল আর রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ উত্তাল তরঙ্গে তখনকার পূর্ব জার্মানী। ইতিহাসের রেকর্ড ভঙ্গকারী অন্ততঃ ২০ লাখ

www.nagorikpathagar.com

বিক্ষোভকারী ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৯তে বৃহত্তর গণতন্ত্রের দাবীতে পূর্ব জার্মানীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক হাজার ৩শ কিলোমিটার (৭৮০মাইল) দীর্ঘ মানব শৃংখলা রচনা করে। দেশের উত্তরাঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ শ্রমিক, বন্দর কর্মী ও নাবিক, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও কৃষক এবং দক্ষিণাঞ্চলের কারুশিল্পী ও ধর্মযাজকরা পরস্পর হাত ধরা ধরি করে ১৫টি মিনিট ধরে অবস্থান করেন। পূর্ব জার্মানীর পূর্বও পশ্চিমাঞ্চলেও একই ধরনের মানব শৃংখল রচনা করা হয় তাসের খবরে বলা। বিক্ষোভ কারীরা পূর্ব জার্মানবাসীদের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ইতিপূর্বে পূর্ব জার্মান নেতা এরিখ হোনেকার পূর্ব জার্মানির জন্য সংস্কারের ধারণাকে বাতিল করে দেন। মস্কোভিত্তিক প্রাভদা পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎ কারে বলেন, পূর্ব জার্মানীর সার্ব ভৌমত্বে কোন আঘাত প্রতিহত করতে তিনি শক্তি প্রয়োগের বিষয় বিবেচনা করবেন। পুঁজিবাদ ও এর চক্রের প্রতি পিছু হটে সমাজবাদের ভাল দিকটির প্রতি তাকানোর পরামর্শ হচ্ছে উচ্চভূমি থেকে আমাদের ওপর বারিবর্ষন। হোনেকার বলেন, পূর্ব জার্মানীর শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী রয়েছে এবং এটা তার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপের প্রচেষ্টায় যে কারো জন্য স্পষ্ট। তিনি বলেন, পশ্চিম জার্মানীর চরম জাতীয়তাবাদী মহল পূর্ব জামানীকে গিলে ফেলার ধারণাটিকে এখনও পরিত্যাগ করেনি।

এতসব ঘটনার পর ১৯৮৯'র ১৭ই অক্টোবর পূর্ব জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রবীণ নেতা এরিখ হোনেকা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের খোলা হওয়ার ঝাপটায় ক্ষমতার গদী থেকে পড়ে গেলেন। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৯৭১ সালে। মার্ক্সবাদী ধ্যান ধারণায় ৭৭ বছর বয়স্ক মিঃ হোনেকা ছিলেন একনায়কতন্ত্রী কট্টর কম্যুনিষ্ট। পূর্ব-জার্মান নেতা এরিক হোনেকারের পদত্যাগের ব্যাপারে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের চাপও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৯'র ৭ ও ৮ অক্টোবর পূর্ব বার্লিন সফরকালে প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ সেদেশের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্যকে বলেন যে, মিঃ হোনেকার (৭৭) এতো অসুস্থ যে তার পক্ষে দেশ চালানো সম্ভব নয় বলে তার ধারণা। মিঃ গরবাচেভ এই ধারণাও ব্যক্ত করেন যে, মিঃ হোনেকারের পক্ষে সেরে উঠাও সম্ভব নয়। পশ্চিম জার্মানীর পত্রিকা বিল্ড জেইতুং'র এক সংখ্যায় বলা হয় যে, তার এই রিপোর্টের তথ্যাদি সরাসরি পূর্ব জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের সূত্রে পাওয়া। উল্লেখ্য, ১৯৮৯'র আগষ্টে মিঃ হোনেকারের দেহেগলব্লাডার অপারেশন করা হয়। ১৯৮৯'র অক্টোবরের পলিটব্যুরোর এক তুমুল বিতন্ডা পূর্ণ বৈঠকে মিঃ হোনেকার বিরোধীদের প্রতি এই বলে বিষোদাগার করেন যে, যদি আমরা তাদেরকে এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেই তাহলে সবকিছুরই পতন ঘটবে এবং আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী ও পুনরেকত্রীকরণের পক্ষে কাজকর্ম গুটিয়ে আনতে হবে। কিন্তু নিরাপত্তা মন্ত্রী এরিক মিলকী এবং অন্যান্যরা মিঃ হোনেকারের বিরুদ্ধে জোরালো

www.nagorikpathagar.com

যুক্তি উথাপন করে পূর্ব-জার্মানী একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলে তিনি রাষ্ট্র প্রধানও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ইস্তিফা দেন।

পত্রিকাটি আরো জানায়, মিঃ হোনেকার কেন্দ্রীয় কমিটির অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে ফেরানোর কৌশল জনক পরিকল্পনা হিসেবে ইস্তিফা দেন। কিন্তু পত্রিকা জানায়, তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়নি। তিনি যখন পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন কেউ তার প্রতিবাদ করেনি এমনকি কোন কথাও বলেনি। শুধু প্রাথমিক এক ইশতেহারে জানানো হয় যে, মিঃ হোনেকার, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ গুন্টার মিটাগ এবং প্রচার মাধ্যমের প্রধান জেয়াচিম হেরমান পদত্যাগ করেন। তাদের পদত্যাগের জন্য স্বাস্থ্যগত কারণ দেখানো হয়। কিন্তু পরে এটা প্রকাশ পায় যে, মিঃ হোনেকার ছাড়া বাকী দু'জনকে আসলে বহিস্কার করা হয়।

পদত্যাগের পর মিঃ হোনেকার সম্পূর্ন একাকী বৈঠক ত্যাগ করেন। কয়েকজন সদস্য এ সময় উঠে দাঁড়ালেও কেউ হাততালি দেয়নি। তাঁর বৈঠক ত্যাগের পর এখন ক্রেঞ্জ সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন।

পুরানো বোতলে নতুন মদ, ইগোন ক্রেঞ্জের চিন্তা ধারার প্রতিকৃতি ক্রেঞ্জের প্রতিজ্ঞা, গির্জার নেতৃবৃন্দের হতাশা

এরিখ হোনেকারের পর পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধান হয়ে আসেন পূর্বজার্মানীর নয়া নেতা ইগোন ক্রেঞ্জ। প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল- ক্রেঞ্জ হয়তো একটু অন্য রকম হবে। নরম হবে। কিন্তু তার পর পরই লক্ষ্য করা যায় নীতি নির্ধারনীর দিক দিয়ে ক্রেঞ্জ ও কম নন। যে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে তাকে তিনি সহজভাবে দেখেন না। সংস্কার সাধনের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহও নেই, আবার ব্যস্ততাও নেই।

এই পূর্ব জার্মানীর নেতৃত্বে রদবদলের পর নতুন নেতা ইগোন ক্রেঞ্জ গণতন্ত্রকামী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমনের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করার পর যখন থেকে দেশ ত্যাগীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। পূর্ব জার্মানীর বিরোধী ও গির্জার নেতৃবৃন্দ ও এই পরিবর্তনের ব্যাপারে হতাশা ব্যক্তকরে।

মিঃ ক্রেঞ্জ দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই টেলিভিশনে প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী এক ভাষণে তিনি বলেন, হাঙ্গেরী বা পোল্যান্ডের মত গণতন্ত্রকামী কোন আন্দোলন তার দেশে দেখা দিলে

www.nagorikpathagar.com

কম্যুনিষ্ট পার্টি তা প্রতিহত করবে। তিনি হুমকী দিয়ে বলেন, গণতন্ত্রকামীদের সংগে কোন প্রকার ক্ষমতার ভাগা ভাগি হবে না।

ক্ষমতা অব্যবহিত পরই ক্রেঞ্জ পূর্ব বার্লিনের একটিমেশিন টুলস ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে যান। একজন শ্রমিক তাকে জানান, জনগণ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। তারা এই নতুন নেতার সহানুভূতি কামনা করেন। এরপর এক সাক্ষাৎকারে ইগোন ক্রেঞ্জ বলেন, সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো কাজ, কাজ এবং আরো কাজ। প্রতিটি মানুষকে গভীর আনন্দ সহকারে এই কাজ করতে হবে। ক্রেঞ্জ কট্টরপন্থী নেতা। তার পূর্বসূরী হোনেকারের সাথে ছিল বেশ কিছু বিষয়ে মত পার্থক্য। অন্যান্য নেতার সাথে ক্রেঞ্জ সম্পর্কে মন্তব্য করতেন এই বলে যে, "ভালো শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র।"

পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যে ধারণা করে ফেলেছেন যে, ক্রেঞ্জ মিখাইল গর্বাচভের মত নয়। গর্বাচেভের মত তিনি কোন পথও নেবেন না। কম্যুনিষ্ট পদ্ধতির কোন মৌলিক পরিবর্তন তিনি করবেন না। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট পার্টির স্থলে অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী ধরনের পার্টির ভিত শক্ত করতে দেয়া হয় তাই কম্যুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ করা হয়। এর পাশাপাশি ক্রেঞ্জ উল্লেখ করেন, কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কল্পনা করা যায় না।

ক্রেঞ্জের স্বরূপ বুঝা যায় যখন তিনি পশ্চিম জার্মানী সফরে ছিলেন। বেইজিং'র তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে গণহত্যা চলার সময় তিনি তথায় প্রকাশ্য চীনা সরকারকে সমর্থন জানান। তাইতো কাসটেন ভয়েট একজন পশ্চিম জার্মান সোশাল ডেমোক্র্যাট যিনি ১৫ বছর ধরে ক্রেঞ্জকে চেনেন এবং মন্তব্য করে বসেন যে, ক্রেঞ্জ ক্ষমতায় আসায় প্রকৃতপক্ষে পূর্বজার্মানীতে কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না। তিনি বলেন, "ক্রেঞ্জ সব সময়ই একজন আপোষহীন মার্ক্সবাদী, লেনিনবাদী,' এ প্রসঙ্গে ভয়েট পূর্ব জার্মানীতে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় ক্রেঞ্জের কী প্রতিক্রিয়া হয় সে কথা স্মরণ করেন। ভয়েট বলেন, ক্রেঞ্জ সে উদ্যেগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "মানুষকে ভোটের অধিকার দিলে তারা আমাদের ক্ষমতাচ্যুত করবে।" এ হেন ক্রেঞ্জ যে বেজিং সরকার পরিচালিত তিয়েন আনমেন হত্যাকান্ডকে সমর্থন করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? পূর্ব বার্লিনে পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের সাবেক প্রধান ক্লাউস বোলিং বলেন, 'দূরদৃষ্টি বা নেতৃত্বের গুণাবলী বলতে কিছুই নেই ক্রেঞ্জের। নেহায়েতই এক আমলা তিনি।

অকম্যুনিস্ট সরকারের ধারাবাহিকতা

সময়ের ঘূর্ণায়মান প্রেক্ষিতে জার্মান জাতির উপর একটা বিশেষ সময় অতিক্রান্ত হলো। বিশ্বের অন্যান্য জাতির ন্যায় জার্মান জাতিরও একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে

www.nagorikpathagar.com

জার্মান জাতির অনেক কিছুই দেখা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা আমাদের কমবেশী জানা আছে। এককালের ক্ষমতাধর শক্তিশালী জার্মানকে কম্যুনিজমের স্বাদ ও আরো উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের অধীনস্থ থেকেই দিনাতিপাত করতে হয়েছে। এ ছিল তাদের পাপের ফলভোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ক্রান্তি লগ্নে তাদের পীড়া দিচ্ছিল। তাইতো বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার খপপড়ে পড়ে যেতে হলো। পূর্ব জার্মানীর কপালে পড়লো কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা এবং পর্যায়ক্রমে তার অপনোদনও হলো। পূর্ব জার্মানীর নতুন দৃষ্টি সম্পন্ন পার্লামেন্ট ১৩ই নভেম্বর প্রথমবারের মত গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করলো এবং গণতান্ত্রিক কৃষক দলের গুন্টার মল্যুডা অপ্রত্যাশিত ভাবে পার্লামেন্টের স্পীকার নির্বাচিত হয়। কয়েক দশক ধরে পূর্ব–বার্লিনে এমন গোপন নির্বাচন কখনোই অনুষ্ঠিত হয়নি। তীব্র প্রতিদ্বন্দীতা পূর্ন নির্বাচনের ফলাফল ছিলো অনিশ্চিত এবং মিঃ গুন্টার মল্যুডা খুব সামান্য ভোটে লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির ম্যানফ্রেড গ্যার ল্যাচকে পরাজিত করেন। নতুন স্পীকার নির্বাচনে ৪ জন প্রার্থী ছিলেন। তাদের সবাই অকম্যুনিষ্ট। নির্বাচনের ঘটনাবলী পূর্ব জার্মান টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তবে স্পীকার পদে কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন প্রার্থী ছিলো না।

১৮ই নভেম্বর পূর্ব জার্মান পার্লামেন্ট একটি নতুন মন্ত্রীসভা অনুমোদন করে। উল্লেখ, ২৭ আসন বিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভার এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে অকম্যুনিষ্ট সদস্য। পাঁচশ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা হাত তুলে নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। ছয়জন ভোটদানে বিরত থাকে। সরকারে কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৬ জন সদস্য বহাল তবিয়তেই থাকেন। ১১জন হচ্ছেন ৪টি ক্ষুদ্র দলের। এদের মধ্যে ৪ জন হচ্ছেন সংস্কারপন্থী লিবারেল ডেমোক্রেট, ৩ জন খৃষ্টান ডেমোক্রেট। কৃষকদল এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক দল থেকে দু'জন করে মন্ত্রী নেয়া হয়। পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী হ্যান্স মডরোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী অনুমোদিত হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে এসব আমুল পরিবর্তন মূখী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এসব প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। প্রস্তাবে রাজনৈতিক ও আদর্শগত সহিষ্ণুতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলা হয়, নিরাপত্তা পুলিশের কর্তৃত্ব হ্রাস করা হবে। প্রস্তাবে অবাধ নির্বাচনেরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। পার্লামেন্টের একটি নয়া কমিটি গঠন ও অনুমোদন করা হয়। পূর্ব জার্মানীতে সংস্কারেরজন্য অব্যাহত চাপের মুখে সে দেশের নতুন নেতা এগণ ক্রেঞ্জ প্রথমবারের মত ক্ষমতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির একাধিপত্যের সাংবিধানিক ধারা পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি সংবিধানের সেই অনুচ্ছেদটি বাতিল করতে চান যাতে পূর্ব জার্মানীকে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বর্ণনা না করা হয়। তিনি বলেন, অতীতের কট্টর কম্যুনিষ্ট নীতির কারণে অনেক মৌলিক ভুলত্রুটি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজে সংকট দেখা দেয়।

নভেম্বরে উপরোক্ত ঘোষণার পর ১লা ডিসেম্বর পূর্ব জার্মানীর পার্লামেন্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির একচেটিয়া ক্ষমতা ধরে রাখার অধিকার প্রদানকারী

www.nagorikpathagar.com

অনুচ্ছেদটি বাদ দেয়ার পক্ষে রায় দেয়। মাত্র ৫ জন ছাড়া ৫শ' আসনের পার্লামেন্টের বাকী সকল সদস্য সংবিধানের এ পরিবর্তনের স্বপক্ষে তাদের ভোট দেন। বহুদিন থেকে পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে এবং অবাধ নির্বাচনের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও বিক্ষোভ হয়।

হোনেকারের কম্যুনিস্ট দুঃশাসনের তদন্তের কিছু কথা

পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টি ২৪শে নভেম্বর এক ইশতেহারে জানায় দেশের অপসারিত নেতা এরিক হোনেকারকে পার্টি থেকে বহিস্কারের পর সম্ভাব্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তারা ক্ষমতায় থাকা কালে তার ভ্রান্ত শাসনের ব্যাপারে তদন্ত করার কথা বলা হয়। পার্টি হোনেকারের সহযোগী পলিট ব্যুরোর সাবেক সদস্য গুন্টার মিটাগকেও বহিস্কার করে। মিঃ মিটাগ বহিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দেশের নয়া কোয়ালিশন সরকার খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য চোরা চালান দমনের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার ঘোষণা প্রদানের পরপরই টেলিভিশনের উক্ত ঘোষণা দেয়া হয়। পশ্চিম জার্মানীতে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা নিষেধ প্রত্যাহারের পর থেকে চোরাচালান বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব জার্মানীর সাবেক নেতা এরিক হোনেকার তার মন্ত্রী ও গোয়েন্দা পুলিশের সাবেক প্রধানকে তাদের পার্লামেন্ট আসন ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়।

পূর্ব জার্মানীর সাবেক নেতা এরিক হোনেকারসহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাকে গৃহবন্দী করা হয় ৬ই ডিসেম্বর তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠে। সাবেক কর্মকর্তাদিগকে তাদের বিলাসবহুল বাসগৃহ থেকে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। গৃহ বন্দীদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন কম্যুনিষ্টের সাবেক শীর্ষ নেতা এরিখ হোনেকার পলিটব্যুরোর সাবেক সদস্য হ্যারম্যান, গুয়েন্টার পিটাক এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক প্রধান হ্যারিশতি। সরকারেরপক্ষ থেকে সাবেক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ সূচারুভাবে তদন্ত হয়নি বলে প্রসিকিউটর জেনারেল গুয়েন্টার ওয়েল্ড ল্যান্ড এবং তার সহকারী পদ ত্যাগ করে।

পূর্ব জার্মান সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের একজন পলাতক কর্মকর্তা আলোকজান্ডার শ্যালককে খুঁজে বের করার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য কামনা করে। তার বিরুদ্ধে তথ্য ও অস্ত্র পাচার এবং আত্মসাতের অভিযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র সরকারী কৌসুলীর দফতরে দাখিল করার পরও তাকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহে জনগণের সাহায্য কামনা করে। ইতিমধ্যে পূর্বে বার্লিনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভবন থেকে কিছু কাগজ পত্র সরানোর সময় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

www.nagorikpathagar.com

নিমজ্জিত পলিট ব্যুরোর আশু পদত্যাগ চায়। অন্য একজন পার্টির দুর্বল নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন,কম্যুনিস্ট পাটিকে অবশ্যই নিম্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে।

হাজার হাজার লোক বার্লিনের পশ্চিম পোর্টসডামের রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করে। উল্লেখ সেখানে বিরোধী গ্রুপ নিউ ফোরামের একজন সদস্য মিঃ ক্রেঞ্জের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক প্রধান হেইঞ্চ ডেইজের লিখিত পত্রটি পাঠ করেন। পত্রে মিঃ হেইঞ্জ বলেন, পার্টির প্রধান নীতি নির্ধারণী সংস্থা পলিট ব্যুরোর প্রতি তার মোটেই আস্থা নেই।

নিউ ফোরাম ও পূর্ব জার্মান সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির আহবানে হাজার হাজার গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারী পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মেগডিবার্গের একটি গীর্জার সম্মুখে সমবেত হয়।

এর পর পরই জনগণের ব্যাপক চাপের মুখে পূর্ব জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ক্ষমতাসীন পলিটব্যুরোর সকলেই পদত্যাগ করেন। জরুরী ভিত্তিতে পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্টির দীর্ঘ কালীন নেতা এরিখ হোনেকার ও অপর কয়েকজন কর্মকর্তাকে বহু বছরের দুঃশাসনের অপরাধে পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়। এ ছাড়া ব্যুরো সদস্য একজন উর্ধ্বতন পার্টি কর্মকর্তাকে গ্রেপতার করা হয়। পলিট ব্যুরোর অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে দুর্ণীতির অভিযোগ আনা হয়।

জার্মানীর একত্রীকরণ

জার্মান জাতি একত্রেই ছিল। আবার ভাগ হতে হলো। বর্তমান আধুনিক ও প্রযুক্তিগত যুগের এই সময়ে জার্মানীর একত্রীকরণ কল্পনা ও করা যেতোনা। কিন্তু ১৯৮৯ 'র প্রথম দিকে বিশেষ করে অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরী সীমান্ত, পাড়ি দিয়ে লক্ষ লক্ষ পূর্ব জার্মানীর নাগরিক পশ্চিম জার্মানীকে প্রবেশ করে। পূর্ব জার্মানীর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সোভিয়েট ধরণের সংস্কারের বিরোধী পূর্ব জার্মানী কর্তৃক কম্যুনিস্ট শাসক এরিকহোনেকারের শাসন ক্ষমতা থেকে বিদায় এবং গণতন্ত্রায়নের প্রতি নয়া নেতৃত্বের নমনীয় মনোভাব এবং সর্বশেষ বার্লিন প্রাচীরসহ পূর্ব-পশ্চিমের অন্যান্য সীমান্ত খুলে দেয়া এবং প্রায় ৪৩ লক্ষ পূর্ব জার্মানীকে পশ্চিম জার্মানীতে গমনের ভিসা দেয়ার ফলে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা দুই জার্মানীর একত্রীকরনের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্ত করে দেবার পর ১০ লক্ষের (১৩/১১/৮৯ পর্যন্ত) ও বেশী পূর্ব জার্মান পশ্চিম বার্লিনে যায় এবং পশ্চিম জার্মানী গমনের ভিসা গ্রহণকারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় পূর্ব জার্মানীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ।

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্ব জার্মানীর নয়া নেতা এগন ক্রেঞ্জের সাথে টেলিফোনে আলাপকালে তাঁর সাথে পূর্ব জার্মানীতে বৈঠকের ব্যাপারে মিলিত হতে সম্মত হন। উভয় নেতা বৈঠকের ব্যাপারে রাজী হলেও ক্রেঞ্জ কোহলকে বলেন,

www.nagorikpathagar.com

প্রবল চাপে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এসব নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ হোল, দেশের সাধারণ মানুষ যখন কঠিন দুর্দিন ও পণ্য ঘাটতির মধ্যদিয়া কালাতিপাত করেছে তখন নেতারা আরাম-আয়েশে বিলাসী জীবন যাপন করেছেন। একটি সংসদীয় রিপোর্টে বলা হয়, কতিপয় পার্টিনেতা বিলাস বহুল বাড়ী অবকাশ যাপন, বাংলো ইত্যাদির মালিক বনেছেন। তারা জীবনকে আয়েশপূর্ণ করার জন্য ভৃত্য নিয়োগ করেন। রিপোর্টে পার্টি নেতাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ করা হয়।

গণতন্ত্রের দাবী ও জার্মানের পুনরেকত্রীকরণ ও সঙ্কটাপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা

অনেক দাবী দাওয়া ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ব জার্মান জনগণ কম্যুনিষ্ট দুঃশাসনের সময় উচ্চারণ করতে পারেনি। বিশ্ব ব্যাপী বিদায়ের পথে কম্যুনিজম যখন এই রকম সুরধ্বনি পূর্ব জার্মানবাসীরা শুনতে পেল তখন তারা বসে থাকেনি। ধীরে ধীরে সুযোগের অপেক্ষার প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্তকে তারা কাজে লাগাতে চাচ্ছে। একটা কথা প্রণিধান হলেও সত্য যে, মানব বিধ্বংসী কামানের ন্যায় পঁচা আপেলের কম্যুনিজম বিশ্ব ব্যাপী যতটুকুন সংস্কার আন্দোলন, গ্লাসনস্ত বা পেরেস্ত্রয়কা বা অন্য কিছু দিয়ে শেষ রক্ষার আবেদনটুকু আছে তা আর বেশী দেরী নাই পুরোপুরি বিদায় নিতে। সময়ের অপেক্ষায় তারাও হয়তো তাদের সামনে পুঁজিবাদী ব্যাপারে মনে মনে ধ্যান ধারণা করছে কিন্তু সেটাও সত্যিকার সমাধান কিনা তা পাঠককুলই বিচার করবেন।

সর্বশেষে ৪ঠা ডিসেম্বর জানা যায় পূর্ব জার্মানীতে বৃহত্তর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে ২০ লক্ষ বিক্ষোভকারী প্রায় ৮ শত দীর্ঘ মানব বন্ধন রচনা করে। পূর্ব জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। বহু শিশুসহ সব বয়সী নারী-পুরুষ এই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে। বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান লেখা ব্যানার বহন করে। একটি ব্যানারে লেখা ছিল, স্ট্যালিনবাদী ও স্নায়ুযুদ্ধপন্থী এগোন ক্রেঞ্জের ক্ষমতায় থাকা চলবে না। ইতিপূর্বে পশ্চিমাঞ্চলীয় পলয়েন সিটিতে প্রায় ১৫ হাজার লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া করার অভিযোগকরেন।

এই নতুন সরকারের প্রতি ধিক্কার জানানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির ৫ হাজারের অধিক সদস্য পার্টির পলিট ব্যুরোর সকল সদস্যের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবীতে পার্টির পূর্ব বার্লিনস্থ কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পূর্ব জার্মান নেতা ইগন ক্রেঞ্জের ছবি সম্বলিত একটি ব্যানারে লেখা ছিল; ক্ষমতার অপব্যবহার ও দূর্ণীতির পংকে

www.nagorikpathagar.com

তাঁদের আলোচ্য সূচীতে পুণঃএকত্রীকরনের বিষয়টি স্থান পাবে না। ফ্রেঞ্জ বলেন,দুই জার্মান রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম, এই অস্তিত্ব অবশ্যই বজায় থাকবে।

উল্লেখ, ইতিপূর্বে সংস্কারের প্রশ্নে হোনেকারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব জার্মান সরকারের ভূমিকা সোভিয়েট সমর্থন না পেলেও এবার দুই জার্মানীর পুনঃ একত্রীকরনের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্তমান পূর্বজার্মান নেতৃত্বের মনোভাবের প্রতি সমর্থনদেয়।

দুই জার্মানীর পুন একত্রীকরন বিষয়ে জার্মান বংশোদ্ভুত সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বেশ উদ্বিগ্ন। তাঁর মতে, একটি নিরপেক্ষ জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিণাম খুবই বিপজ্জনক হবে, এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েরই নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকী হয়ে দেখা দেবে।

অতীতে জার্মান যে ভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে ইতিহাসে তার ভয়াবহ ছাপ রেখে গেছে,নতুন করে একটি নিরপেক্ষ জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলে সে দেশটি ও ভবিষ্যতে সে ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় জোটেই আতংকের শিকার হতে পারে। কাজেই বুদ্ধির কাজ হবে জার্মানী ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংগে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে পূর্ব জার্মানীর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বিধান করা। অনেকে হেনরী কিসিঞ্জারের মন্তব্যে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, জার্মান জাতির বিশ্ব যদ্ধ কালীন আগ্রাসী নীতি ও হিটলারের ইহুদী নিধন ইত্যাদিই তাকে আতংকগ্রস্ত করে তুলে। যদ্দরুন তিনি জার্মানীর একত্রীকরন সমর্থন করতে পারেননি।

জার্মানীর একত্রীকরনের প্রশ্নে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল বিষয়টি পূর্বজার্মান জনগণের উপর নির্ভর করে বলে মন্তব্য করেন। অবশ্য আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের অবাধ সুযোগে তারা তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারে। তবে হেলমুট কোহল জার্মান পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ফরাসী প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ ,বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থেচার ও সোভিয়েট নেতা ও সমাজ তান্ত্রিক বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এ সব আশাবাদ ব্যক্ত করলেও হেলমুট কোহল পরবর্তীতে হতাশা প্রকাশ করেন। তবে এক পর্যায়ে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জবুশকে জানান যে, দুই জার্মানীর একত্রীকরনের ব্যাপারে তখনই অগ্রগতি হতে পারে যখন পূর্ব জার্মানীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ৪ঠা ডিসেম্বর মাল্টায় দু'দিনব্যাপী মার্কিন–সোভিয়েত শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার পর চ্যান্সেলর কোহল ব্রাসেলসে প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে সাক্ষাৎ করে দুই জার্মানীর একত্রীকরনের ব্যাপারে তার দশ দফা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। মিঃ কোহল জোর দিয়ে বলেন, তার পরিকল্পনাটি একটি কনফেডারেশন কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর কনফেডারেশন গঠনের ব্যাপারটি পুরোপুরি

www.nagorikpathagar.com

নির্ভর করছে পূর্ব জার্মানীতে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পশ্চিমের নিরাপত্তা নীতির ওপর। তিনি জানান, জার্মান সমস্যার সমাধান একমাত্র ইউরোপের ছায়াতলেই সম্ভব। অবশ্য ইতিপূর্বে তিনি জানিয়েছিলেন যে, জার্মানীর ভবিষ্যৎ ন্যাটো ও ইইসির মধ্যেই নিহীত।

জার্মানীর একত্রীকরণের প্রশ্নে পশ্চিমা ব্লকের নেতা ও মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেমস বেকার বলেন, এটা অবশ্যই পশ্চিমা মূল্যবোধের ভিত্তিতে হতে হবে। তিনি বলেন, "শান্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতেই কেবল আপোষ হতে পারে।

এদিকে ২১শে নভেম্বর পূর্ব জার্মানীর সংস্কারবাদী লক্ষ লক্ষ নাগরিক কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বিভক্ত জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণের দাবীতে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা পূর্ব জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা এগোন ক্রেঞ্জ এবং সোভিয়েত নেতাদের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে। লিপজিং নগরীতে এই বিক্ষোভে দুই লক্ষাধিক লোক যোগ দেয়। ড্রেস ডেন কার্ল মার্ক স্টাট, নিউ ব্রান্ডেনবার্গ, হালে সোয়ারিন এবং বোটবাস শহরেও যুক্ত জার্মানীর পক্ষে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভে যোগ দেয়। তারা ধ্বনি দেয়– জার্মানদের পিতৃভূমি এক ও অবিভক্ত।

পূর্ব জার্মান অর্থনীতির কিছু প্রেক্ষাপট

কম্যুনিস্ট ভুক্ত কোন দেশের অর্থনীতিই স্বচ্ছ নয়, যদ্দরুন মার্ক্সবাদীর তত্ত্বগত দিক দিযে পেট ভরানো যায়নি। শ্রেনীগত দিকের মুলোৎপাটন ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বলা হলেও সব দেশেই কমপক্ষে মার্ক্সীয় অর্থনীতি হোচট খেয়েছে। এবং সে ভাবেই আস্তে আস্তে মার্ক্সবাদ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। ইউরোপীয়ান ব্লকের দেশ পূর্ব জার্মানী। এককালে তো বিশ্বব্যাপী তারা চরম শিখরেই ছিল, যখন গোটা জার্মান যৌথ একটি দেশ ছিল। কিন্তু জার্মান দ্বিখন্ডিত হওয়ার পর বেচারী পূর্ব জার্মান ছিটকে পড়লো পোড়া কপাল সমাজতান্ত্রিক ব্লকে।

এক হিসেবে জানা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের ছয়টি সমাজতান্ত্রিক দেশের মোট ১৩ হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ রয়েছে। এখবর পরিবেশন করে মস্কোভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা আরগুমেন্টস এন্ড ফ্যাক্টস। এবং এর উদ্ধৃতি তাস পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। এখান থেকেই দেখা যায় পূর্ব জার্মানীর বৈদেশিক ঋণ ১৯০০ কোটি ডলার। আর পূর্ব জার্মানীতে জনগণের মাথা পিছু উৎপাদনশীলতা পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় শতকরা ২৫ভাগ কম। ইইসির হিসেব মতে, পূর্ব জার্মানীর ৮০ শতাংশ বাণিজ্য অকম্যুনিস্ট দেশ সমূহের সাথে। এ যেন একটি উদাহরণে স্বচ্ছ হয়ে যায় আমাদের সামনে। ধরা যায়, একটি গাছের উপরের অংশ লাভজনক আর নীচের অংশ অলাভজনক। অথচ যিনি গাছটি বপন করলেন,

www.nagorikpathagar.com

পরিচর্যা করলেন, তিনি পেলেন নীচের অংশ আর তার বন্ধু বেঁচে থাকার তাগিদে উপরের অংশ নিলেন, তাতে করেই বুঝা যায় পূর্ব জার্মানীর ভিত সমাজতান্ত্রিকভুক্ত হলেও গাছের উপরের অংশের ন্যায় তার পুঁজিবাদী দেশ দরকার। পর্যায়ক্রমে দেখাযায় পূর্ব জার্মান সরকার নয়া শুল্ক ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঘোষণা করে। এ সাথে বিদেশীদের কাছে কিছু কিছু ভোগ্যপণ্য বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সীমান্ত খুলে দেয়ার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্রমবর্ধমান কালোবাজারে ব্যবসায় বন্ধ করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়। এতে অনেকেই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী হ্যান্স মড্রোর সরকার ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে অনাগ্রহীতা বুঝা যায়। এটা এমন এক সময়ে ঘটে যখন সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টির শাসন অবসানের দাবীতে রাজপথে বিক্ষোভকারী বিপুল সংখ্যক জনতাকে শান্ত করার জন্য অব্যাহতভাবে কঠোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে অর্থনীতিবিদ ও পশ্চিমী কূটনীতিকরা মন্তব্য করেন যে, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এককালে ওয়ার্শ জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বিবেচিত পূর্ব জার্মান অর্থনীতিকে আরো অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এভাবে করে পূর্ব জার্মানীর অর্থনীতি সংকটের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

পূর্ব জার্মান নাগরীকদের পশ্চিমে কেনাকাটার ধুম এবং একই সঙ্গে দেশের মূল্য ও ভর্তুকী ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী করণের প্রয়াসী ব্যবসায়ীদের কেনাকাটার আনন্দ উন্মত্ততার কারণে পূর্ব জার্মানীর অর্থনীতি মারাত্মকভাবে কার্যতঃ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।

পূর্ব জার্মান নাগরীকরা বিনিময় অযোগ্য লাখ লাখ মার্ক সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানীতে মার্কের বাজার দরের চরম অবনতি ঘটায় ফ্রিল্যান্স ব্যবসায়ীরা পূর্ব জার্মানীতে ভর্তুকী দেয়া পণ্য অল্প মূল্যে কিনে পশ্চিম জার্মানীতে নিয়ে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে। ব্যপক পরিমাণে পূর্ব জার্মান নাগরীক পশ্চিম জার্মান চলে যাওয়ায় তাদের শ্রম শক্তির ঘাটতি পড়ে। এর কারণ হিসেবে জানা যায় অনেক দক্ষ জনশক্তি পশ্চিম জার্মানীতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যদ্দরুন কাঠের কাজে, সেলাইয়ে, চিকিৎসা এবং পশু চিকিৎসা ও মেশিন নির্মান কাজে দক্ষ লোক প্রয়োজন। উদারপন্থী অষ্ট্রিয়ান দৈনিক দ্রার স্ট্যান্ডার্ড অক্টোবরের এক রিপোর্টে জানায় যে, পূর্ব জার্মানী ৮০ হাজার চীনা শ্রমিক নিয়োগের চেষ্টা করে।

পশ্চিমে গমনের এই হিড়িকে শ্রমিক স্বল্পতার দরুণ পূর্ব জার্মান সরকার কারখানা ও খনির শূন্যস্থানে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োজিত করা হয়।

১৯৭০'র দশকে দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় বাধ্যতা মূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার মত লোকের অভাব দেখা দেয়। ফলে রিজার্ভ বাহিনীর সদস্যদের তলব করা হয়। নিয়মানুসারে পূর্ব জার্মানীর সকলকেই ১৮ মাসের মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। অন্যরা কারখানা ও খনিতে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পেরে আনন্দিত। কেননা তারা

www.nagorikpathagar.com

বেসামরিক লোকজনদের সাথে বসবাসের সুযোগ পায়, সন্ধ্যাবেলা স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করতে সমর্থ হয় এবং তাদের সৈন্য হিসেবে প্রাপ্ত দেড়শ' মার্ক মূল বেতনের সাথে একশ' থেকে দেড়শ' মার্ক মজুরী হিসেবে লাভ করে। কোন কারখানায় লোকের ঘাটতি দেখা দিলে তারা স্থানীয় সেনা ব্যারাকের সাথে যোগাযোগ করে ৩ বা ৪ মাসের জন্য সৈন্য সরবরাহ চুক্তি করে থাকে। সর্বোপরি বার্লিন প্রাচীরের ব্যবধান যখন ঘুচে গেছে তখন দুই জার্মানীর ব্যবধান ও একদিন ঘুচে যাবে। প্রভূদের বজ্রমুষ্ঠী ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। দু'টি পরাশক্তি এতদিন পৃথিবীকে নিজেদের স্বার্থে দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছিল।

জার্মানদের বেলায় একটা কথা প্রনিধানযোগ্য সত্য যে, তারা একদা পৃথিবী ব্যাপী ক্ষমতাধর ছিলেন। তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে অন্যান্য পরাশক্তিগুলো বেশীদিন সহ্য করেনি। তাইতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান দু' টুকরো হয়ে গেলো। কর্তৃত্ব এলো পুঁজিবাদী ব্লক যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ফ্রান্সের এবং সমাজতন্ত্রী ব্লক রাশিয়ার। বিশ্বব্যাপী এখন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কবর রচনার সময়। কেন্দ্রীভূত করণের পুঁজিবাদ আর অল্প কিছুদিনের জন্য বিদ্যমান থাকবে। তারপর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সেদিন বেশী দূরে নয়। আর সমাজতন্ত্রের দিনক্ষণ এলো আর গেলো, এমনি সময় অতিক্রান্ত। মানবরচিত মতবাদ আজ ধ্বসে পড়েছে, তারা আজ দৌড়াচ্ছে কেউ সরাসরি পুঁজিবাদের দিকে কেউবা হয়তো তৃতীয় কোন মতাদর্শের দিকে। যেটি প্রকৃতার্থেই ইসলাম ভিত্তিক ইনসাফ কায়েমের কথা বলে, কিন্তু সেটাকে রাখ ঢাক করে তৃতীয় একটা মধ্যবর্তী মতবাদ দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য শান্তি ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাওয়া। আর লক্ষ্যে বা মকসুদে মনজিলে পৌছাতে গেলে অবশ্যই আজ হোক কাল হোক ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে।

জার্মানীরা একত্রিত হবে, এ বাঁধা কেউ দিয়ে রাখতে পারবে না। সাময়িক বিড়ম্বনার পর তারা সারা বিশ্বের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখিয়েই একত্রিত হয়ে বসবাস শুরু করবে, এটা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রীব্লকের জন্য অপ্রিয় হলেও সত্য। এককালের ক্ষমতাধর জার্মান একত্রিত হলে তাদের নীতি নির্ধারণ আপাততঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হবে এবং তার স্থায়ীত্বকাল ও বেশী দিন হবে না। জার্মানসহ আজকের বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগণ চেয়ে আছে তৃতীয় কোন মধ্যবর্তী কল্যানকামীতা ও শান্তিপূর্ণ পথের দিকে।

---

www.nagorikpathagar.com